আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

Necessities and importance of Morality in the establishment of Rule of law and Justice.

ডঃ মোঃ আনছার আলী খান
D. Md. Ansar Ali Khan.

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগাল এইড বাংলাদেশ
Islamic Law Research center and legal Aid, Bangladesh

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও গুর"ত্ব

Neceessities and Importance of Morality in the establishment of Rule of Law and Justice

১। প্রাক কথন ঃ

সমগ্র সৃষ্টি জগতে আইনের শাসন পরিব্যাপ্ত এবং সদা কার্যকর। সূর্য-চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপ-গ্রহ, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, বন-বনানী, পাখ-পাখালী, জীব-জন্তু, কীট-প্রতঙ্গ, অর্থাৎ আকাশ মন্ডল ও ভূ-মন্ডলের উপর ও নিচে এবং মাঝখানে যেখানে যা কিছু আছে সবই সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী সৃষ্টি লগ্ন হতে স্বীয় ভূমিকা পালন করে চলছে এবং চলবে। কোথাও নেই কোন ব্যত্যয়, বিশৃঙ্খলা। এটিই মূলতঃ আইনের শাসনের প্রকৃষ্ট নমুনা। আল-াহর সৃষ্টি জগতের সর্বত্র আইনের শাসন বিরাজমান। মহান আল-াহ বলেন,

'অসীম দয়ালু আল-াহ তা'আলার এই (নিপূণ) সৃষ্টির কোথাও কোন খুঁত (ব্যত্যয়) তুমি দেখতে পাবে না, আবার (তাকিয়ে) দেখ তো! কোথায়ও তুমি কোন রকম অসংগতি দেখতে পাও কি?'- আল কুরআন, সূরা আল মূলক-৩

কিন্তু মানবজাতির প্রতি একটু দৃষ্টি দিলে সেখানে আইনের শাসনের বিধানটি অনুপস্থিত কিংবা বিপরীত দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। এখানে একজন মানুষ অপর একজন মানুষকে যেমন করছে অত্যাচার, যুলুম, তেমনি আদর- যত্ন, অনুরূপ শাসন ও শোষণ, সহযোগিতা প্রতিযোগিতা ও বিরোধিতা, হিংসা বিদ্বেষ ও ভালবাসা। মানব আচরণে যেমন পরিদৃষ্ট হয় কল্যাণকর দিক তেমনি অকল্যাণকর।

এতদৃষ্টে সংগত কারণে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, অন্যান্য সৃষ্টি জগত সুনির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে, তাই সেখানে নেই কোন বিশৃঙ্খলা, অথচ মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় কেন? অথচ মানুষ নাকি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

এ প্রশ্নের জনাব মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য অর্জনে মানুষের ভূমিকাতে নিহিত। এ প্রসঙ্গে আল-াহ বলেন ঃ

* 'আমি দুনিয়াতে আমার খলিফা পাঠাতে চাই।' - সূরা বাকারা ঃ ৩০
* 'আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।'-আল কুরআন, সূরা আল যারিয়াত : ৫৬।
* "সেই আল-াহই তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের ভেতর থেকে কাউকে কার"র চাইতে উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন, যেন তিনি তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তার ভেতর তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।"- আল-কুরআন সুরা আল-আনয়ম ঃ ১৬৫।
* 'আমি তাকে (এই দুনিয়ায় চলার) পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখন সে চাইলে (হেদায়েতের পথে চলে আল-াহর) কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে, আবার চাইলে (বিরোধীতার পথে চলে অকৃতজ্ঞ) কাফের হয়ে যেতে পারে।'- সূরা আদ দাহর : ৩।
* "যেহেতু মানুষের জন্য আমার রচিত আনুগত্যের বিধান ইসলাম মানতে বাধ্য করিনি, সেহেতু তারা আমার বিধান ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য বিধান তালাশ করে (আনুগত্য করে)"।- আল-ইমরান : ৮৩।
* "জলে স্থলে যে বিশৃঙ্খলা কায়েম করেছে তা মানুষের হাতের কামাই।" - সূরা র"ম : ৪১।

উপরোক্ত আয়াতসমূহ হতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, আল-াহ মানব জাতিকে কেবল তাঁর আনুগত্যের পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করে, আনুগত্যের বিধান ইসলাম প্রদান করেছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় সে বিধান অনুবর্তন না করায় মানুষের জীবনে আইনের শাসনের ক্ষেত্রে কিছু ব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হয়। একারণেই পৃথিবীতে মানুষ মানুষের দ্বারা যুলুমের শিকার হচ্ছে।

এই পৃথিবীতে আল-াহ তা'আলা আদম আ.-এর মাধ্যমে মানব জাতির গোড়া পত্তন করেন। আদম আ. এর নিকট আল-াহ তাঁর আনুগত্যের বিধান অবতীর্ন করেন এবং সে বিধান কি ভাবে জারী বা অনুবর্তন করতে হবে তাও বাতলিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আদম আ.-কে এই পৃথিবীতে প্রেরণকালে আল-াহ বলেছিলেনঃ

"আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎ পথের (সত্য বিধান) নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"- সূরা বাকারা : ৩৮।

হযরত আদম আ.-এর সৃষ্টি এবং নবুওয়াত প্রাপ্তি ও তাঁর সন্ড়ানদের মাঝে আল-াহর প্রেরিত বিধান মোতাবেক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটে। পরবর্তীতে আদম আ.-এর সন্ড়ানদের মধ্য থেকে সে নবী ও রসূলের মাধ্যমে সমাজে তথা রাষ্ট্রে ইসলামী বিধান প্রবর্তনের ইতিহাস শুর" হয় হযরত শীস আ. তাদের মধ্যে প্রথম। এ সময় লোকজন দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল আল-াহর আনুগত্যের বিধান অনুসরণ করে এবং অপর দল কাবিলের বংশধরদের অনুসরণ শুর" করে। আল-াহর অবাধ্যতায় অটল থাকে।

বলতে কি, এই পৃথিবীতে আল-াহর বিধানের শাসনের অনুবর্তন ও বিরোধীতার ধারা এ থেকে শুর" হয়।

আল-াহ এই পৃথিবীতে তাঁর আনুগত্যের বিধান মোতাবেক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অসংখ্য নবী-রসুল প্রেরণ করেছেন। আল-াহ বলেন ঃ

"আল-াহর ইবাদত করার ও তাগুতেকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি।"-সূরা নাহল : ৩৬।

নবী-রসূলদের ভূমিকা ছিল এই পৃথিবীতে আল-াহর বিধান মোতাবেক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন পূর্বক মানব জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যান সাধন। মানব জাতির শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স.-এ দায়িত্ব সুষ্টভাবে পালনপূর্বক এক অনন্য নজীর স্থাপন করে গেছেন।

বলতে কি, এই পৃথিবীতে মানুষ আল-াহর খলীফা তথা প্রতিনিধি হিসেব আল-াহর আইন অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকান্ড সুষ্ঠুও ফলপ্রসুভাবে সম্পাদনেই প্রকৃত আইনের শাসন নিহিত।

২। আইনের শাসন কি (What is rule of law)?

আভিধানিক অর্থে আইনের শাসন মানে পরিচালিত করা বা পরিচালিত হওয়া। প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে আইনের বিধান অনুযায়ী জনগণের আচরণ বা ভূমিকা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাকে আইনের শাসন বলে।

আইনের শাসন প্রত্যয়টি প্রধানতঃ দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ ব্যাপক ও সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে আইনের শাসন বলতে জনগণ আইন মেনে চলবে এবং তারা কেবলমাত্র আইনের দ্বারা শাসিত হবে।

সংকীর্ণ অর্থে আইনের শাসন হলো সরকার আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, আইনের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে এবং আইন ব্যতীত স্বেচ্ছামূলকভাবে কিছু করতে পারবে না। শাসকের প্রতিটি কাজের পিছনে অবশ্যই আইনের অনুমোদন (ঝধহপঃরড়হ) থাকতে হবে। একে বলা হয় Government by law not by man.

এখন প্রশ্ন এসে যায়, আইনের শাসনের ভিত্তি কি হবে? শাসনের ভিত্তি যদি কেবল আইন হয় তাহলে ফেরাউন, নমরুদ, ফ্রান্সের রাজা লুই-xiv নেপোলিয়ান, হিটলার, মুসোলিনী, মাউসেতুং, লেলিন প্রমূখ ব্যক্তিদের শাসন তাহলে কি আইনের শাসন ছিল?

বস্তুতঃ আইনের শাসন বলতে এমন আইনের শাসনকে বুঝায় যে আইন হক ও ইনসাফ পূর্ণ, যাতে জনগণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ নিহিত।

পন্ডিতগণ আইনের শাসনের বিভিন্ন সংগা দিয়েছেন এবং নানাভাবে বিশে-ষণের প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনবিদ মরহুম গাজী সামসুর রহমান প্রণীত প্রশাসনিক আইনের ভাষা, গ্রন্থের পৃষ্ঠা ৭৬ ৭৭ তে বিধৃত বক্তব্যটি উপস্থাপন করতে চাই। কেননা উক্ত বক্তব্যে আইনের শাসনের কতিপয় বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, যা কিনা মানব রচিত আইনের শাসনের বাস্তবতার নিদর্শন।

"প্রশাসনিক আইনের অন্যতম মূল আদর্শ হচ্ছে আইনের শাসন। আইনের শাসন পৃথিবীর সভ্য দেশগুলোর সংবিধানেরও মূল ভিত্তি। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত প্রভৃতি দেশের সংবিধানে আইনের শাসনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এসব দেশের সংবিধানে যা বলা হয়েছে তার মূল কথা হলো "শাসন চলবে আইন অনুসারে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মত অনুসারে নয়।" এটাই আইনের শাসনের মূল কথা। বাংলাদেশের সংবিধানেও আইনের শাসনের স্বীকৃতি আছে।

'আইনের শাসন' এই অভিব্যক্তিটির মধ্যে একাধিক প্রত্যয় নিহিত। প্রথমত আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে মানুষের শাসনের বিপরীত ধারণা। অর্থাৎ মানুষের বা ব্যক্তির আদেশ নয়, আইনের আদেশ হচ্ছে একমাত্র প্রতিপালনীয়। কোন মানুষের প্রতি কোন আদেশ দেয়ার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির নেই, যদি না সে আদেশ দেবার বিষয় এবং কর্তৃত্ব আইন দ্বারা প্রদত্ত না হয়। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উলে-খ করছি। বাংলার নবাবদের নিয়ে একটি কাহিনী আছে, কাহিনীটি বোধ করি কল্পিত। কাহিনীটি হচ্ছে জলসা ঘরে বাজনার তালে তালে নৃত্যরত এক তরুণী। তার যৌবন ভরা দেহ নৃত্যের তালে তালে দুলছে। নৃত্য উপভোগ করছেন নবাব এবং তার পাত্রমিত্র, সভাসদবৃন্দ। হঠাৎ জলসা ঘরের একপ্রান্তে উঠে দাঁড়াল এক যুবক এবং বললো, "থাম নর্ককী, তোমার নৃত্যের ছন্দে ভুল হচ্ছে।" অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় অনেকেই বিরক্ত হলেন। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নবাব বললেন, 'এই বেতমিজকে আমি মৃত্যুদন্ড দিলাম। আগামীকাল তাকে শুলে চড়ানো হউক।' পরের দিন প্রত্যুষে নর্তকী নবাবের অনুমতি নিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করে করজোরে নিবেদন করল 'জাহাপনা গোস্তাকী মাফ হয়, গত রাতে যে অসীম সাহসী যুবক আমার নৃত্যে বাঁধা দিয়েছিল তার অসামান্য বিচার শক্তিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। সত্যি আমর নৃত্যে খানিকটা ভুল ছিল। তা কেউ ধরতে পারে নি, একমাত্র ঐ প্রতিভাধর যুবক ছাড়া।' নবাব তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন যুবকের মৃত্যুদন্ড রহিত করা হল এবং তাকে ৫০০ স্বর্ণ মুদ্রা ইনাম দেয়া হোক।

এই যে ঘটনা, হতে পারে এটি কাল্পনিক, এটি মানুষের শাসন, আইনের নয়। কথায় কথায় মানুষকে শূলে দেয়া বা ইনাম দেয়া স্বৈরাচারী নীতি, আইনের শাসন নয়।

ব্যক্তি যত উচ্চ পদেই অধিষ্ঠিত হোন না কেন, তার কোন ক্ষমতা নেই, ক্ষমতা আছে কেবল আইনের এটা আইনের শাসনের মূল কথা। মানুষ সর্বাবস্থায় দাবি করতে পারবে যে, সে একমাত্র আইনের; শাসন মানবে, অন্য কারো আদেশ নিষেধ নয়। মানুষ আইনের শাসন প্রয়োগ করে, তাই বলে আইনের শাসনকে মানুষের শাসন বলে ধরে নেয়া ঠিক নয়, কারণ আইন প্রয়োগকারী কোন ব্যক্তি আইনের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। করলে সেটা আর আইনের শাসন থাকে না। অতএব আইনের শাসন হচ্ছে, আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক আইনের নির্ধারিত সীমার ভেতর থেকে শাসন কাজ পরিচালনা।

দ্বিতীয়ত আইন বলতে বৈধ আইন বুঝায়। খেয়াল খুশীমত তৈরি আইনকে আইন বলা যায় না। আইন হতে হবে সংবিধানে বর্ণিত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত, গৃহীত এবং মৌলিক অধিকারানুগ। যিনি যখন আইন জারি করবার অধিকার রাখেন, তিনি কেবল সে সময় আইন জারি করতে পারেন। সংসদ চলাকালে রাষ্ট্রপতি কোন আইন বা অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন না। আবার সংসদ চলাকালে রাষ্ট্রপতি কোন আইন প্রণয়ন ও জারি করেন যা সংবিধানে বর্ণিত কোন মৌলিক অধিকারকে আহত করে তার সেই আইন বৈধ নয়।

তৃতীয়ত ঃ আইনের শাসন বলতে বৈধ আইনের বৈধ প্রয়োগ এবং আইন বৈধ কিনা বা তার প্রয়োগ বৈধ কিনা তা দেখবার মত সংস্থা থাকা বুঝায়। নির্বাহী কর্তৃত্ব যদি আইনের সীমা অতিক্রম করে, তবে সেই বাড়াবাড়ি হতে মানুষকে রক্ষা করার জন্য বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা থাকা চাই নতুবা আইনের শাসন অর্থহীন হয়ে পড়ে। যে দেশে বিচার বিভাগ শক্তিধর নয়, সে দেশে বিচার বিভাগীয় আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয় না, সে দেশে মৌলিক অধিকার বা আইনের শাসন অর্থহীন।

চতুর্থত: আইনের শাসন বলতে আইনের সৎ ও সাধু প্রয়োগ বুঝায়। কিংবা বিদ্বেষের বশবতী হয়ে আইন প্রয়োগ আইনের শাসনের বিপরীত।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের শাসন বলতে অধ্যাপক ডাইসী প্রদত্ত সংগাকেই মডেল হিসেবে ধরা হয়। ডাইসী আইনের শাসনের তিনটি নীতির কথা বলেছেন : (ক) Absence of arbitrary power অর্থাৎ স্বৈরী ক্ষমতার অনুপস্থিত ঃ

(খ) Equality before law অর্থাৎ আইনের চোখে সমান এবং (গ) Citizen's right নাগরিক অধিকার। যে শাসন ব্যবস্থায় এ তিনটি নীতি বিদ্যমান থাকবে, সেটিই ডাইসীর মতে আইনের শাসন হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩। আইনের শাসন একমাত্র ইসলামে (Rule of law is only in Islam)

প্রকৃত অর্থে আইনের শাসন বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র ইসলামেই নিবদ্ধ। কেননা ইসলাম একমাত্র আল-াহ মনোনীত ও অনুমোদিত জীবন ব্যবস্থা, যেখানে আনুগত্য একমাত্র আল-াহর অন্য কারোর নয়। বলতে কি, মানুষের উপর মানুষের প্রত্যক্ষ, বা পরোক্ষ প্রভু হিসেবে আনুগত্যের দাবী এবং প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই হচ্ছে দুনিয়ার সর্বকালের, সর্বজাতির ও সকল দেশের সকল প্রকার অশান্তি ও বিপর্যয়ের মূল কারণ।

মহান আল-াহ বলেন ঃ

১. আল-াহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না বা ফয়সালা করে না তারাই যথার্থ (সত্য প্রত্যাখ্যান কারী)। আল কুরআন, সূরা মাযেদা : ৪৪-৪৫।

২. "তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তারই অনুসরণ করো। তাঁকে বাদ দিযে অন্যকোন (মনগড়া) কর্তা ও পৃষ্ঠপোষকের অনুসরণ করোনা।"-সুরা আ'রাফ : ৩।

৩. "আর আল-াহর অবতীর্ন বিধান অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা করো। তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করোনা। সাবধান থেকো, তারা যেন তোমাকে ফিতনায় নিমজ্জিত করে আল-াহর অবতীর্ণ বিধান থেকে এক বিন্দুও বিভ্রান্ড় করতে না পারে।" সূরা-আল-মায়িদা : ৪৯।

৪. "হে দাউদ! আমরা তোমকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি। সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে সত্যের ভিত্তিতে শাসন চালাও। যদি ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো; তাহলে তা তোমাকে আল-াহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।"- সূরা সোয়াদ : ২৬।

৫. "আল-াহ ছাড়া আর কারোর শাসন চলবেনা, তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া আর কারোর দাসত্ব করোনা। এটাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা।"-সূরা ইউসুফ : ৪০।

৬. "তারা জিজ্ঞাসা করে, ক্ষমতায় আমাদের কোন অংশ আছে কি? তুমি বলে দাও; যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল-াহর।"-সূরা আল ইমরান : ১৫৪।

৭. "নিজ নিজ মুখ দিয়ে ভ্রান্ড়ভাবে একথা বলো না যে, এটা হালাল আর এটা হারাম।"- সূরা মায়েদা : ৪৪।

৮. "তোমাদের নিকট যে জ্ঞান পৌঁছিয়েছে, তার পরেও যদি তোমরা তাদের মনের ইচ্ছা ও বাসনা অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতরূপে তোমরা যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।"-সূরা বাকারা : ১৪৫।

৯. "এই আনুগত্য ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করতে চাহে তাহলে সেই পন্থা একেবারেই কবুল করা হবে না এবং পরকালে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে।"- সূরা আল-ইমরান : ৮৫।

১০. "তার চাইতে বড়ো পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে আল-াহর কাছ থেকে আগত হেদায়েতের পরিবর্তে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।"-সূরা আল কাসাস।

আইনের শাসনের ভিত্তিমূল ও প্রাণশক্তি হলো একমাত্র আল-াহর আনুগত্যের বিধান। এই বিধানের বাইরে অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের আনুগত্য মূলক বিধান অনুসরণ করা যাবে না। আইন রচনার ক্ষমতা একমাত্র আল-াহ ছাড়া আর কোরোই নেই। কোন মানুষ, চাই সে নবীই হোক না কেন স্বতন্ত্রভাবে হুকুম দেয়া ও নিষেধ করার অধিকারী নয়। কেননা নবী নিজেও আল-াহর আদেশেরই অনুগত্য করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"আমি শুধু ওহীযোগে নির্দেশই মেনে চলি।"- সূরা আনআম : ৫০।

সাধারণ মানুষকে নবীর আনুগত্য করার নির্দেশ শুধু এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, তিনি নিজের হুকুম নয় বরং আল-াহর হুকুম জারী করেন। আল-াহ বলেন :

- "আমি যাকেই রসূল করে পাঠিয়েছি। আল-াহর অনুমতিক্রমেই তার আনুগত্য করা হবে- এজন্যই পাঠিয়েছি।"- সূরা আলনিসা : ৬৪।
- " কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল-াহ তাকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবূয়্যত দান করবেন আর সে জনগণকে বলবে, তোমরা আল-াহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সে শুধু একথাই বলবে যে, তোমরা আল-াহর দাস হয়ে যাও।"- সূরা আল-ইমরান : ৭৯।

বস্তুতঃ উপরোক্ত আলোচনা হতে এটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল-াহ যে আইন অবতীর্ণ করেছেন সেই ও পরিচালিত। আইনের ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। জনগণ এবং সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র আল-াহর সেই আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড সম্পাদন ও মূল্যায়ন করবে। অন্যকোন আইন বা নির্দেশ দ্বারা নয়। আইনতঃ ও বাস্ড়বতঃ এটিই আইনের শাসনের মূল কথা।

৪। **আইনের শাসনের মৌলিক উপাদান** (Fundamental Elements of Rule of Law)

আইনের শাসনের মৌলিক বা আবশ্যিক উপাদান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আমি এ পরিসরে উক্ত মতভেদ নিয়ে আলোচনা না করে বরং আইনের অপরিহার্য, যা ছাড়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়, সে বিষয়গুলো আলোচনা করব। আইনের শাসনের অপরিহার্য উপাদানগুলো হলো ঃ

১. হক ও ইনসাফ পূর্ণ আইন (Law based on the truth of justice)
২. আইন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অবলম্বন (To adept management process to empliment law)
৩. স্বাধীন বিচার বিভাগ (Independence judiciary).

১. হক্ব ও ইনসাফপূর্ণ আইন (Law based on the truth and justice) :

আইনের শাসনের প্রথম এবং প্রধান উপাদান হলো সত্য ও ইনসাফ পূর্ণ আইন, যা রাষ্ট্রীয় সমাজে জারী বা কার্যকরী হলে সে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কল্যাণ সাধন এবং অর্জিত হবে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আইনের শাসনের যে উদ্দেশ্য তা অর্জনের মৌলিক বিষয় হলো আইন; সে আইন যদি হক বা সত্য এবং ইনসাফপূর্ণ না হয় তাহলে উহা জনগণের যুলুমের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আবার আইন সত্য ও ইনসাফ পূর্ণ কিন্তু তা জারীর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া যদি সঠিক না হয়, তাহলেও জনগণকে উহার জন্য যুলুমের শিকার হতে হয়। অনন্ড় যদি উভয়ইটি সত্য ও ইনসাফপূর্ণ না হয়, তাহলে উহা জনগণের জন্য চরম যুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আইন হক ও ইনসাফপূর্ণ কি না তা নির্ভর করে উহা প্রণেতার ইচ্ছা ও যোগ্যতার উপর। সৃষ্টিকর্তা আল-াহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন স্বেচ্ছায় আনুগত্য করা বা না করার বিষয়ে পরীক্ষার জন্য। স্বেচ্ছায় আনুগত্যে মানুষের কল্যাণ, মুক্তি, শান্ড়ি এবং স্বেচ্ছায় আনুগত্য না করায় মানুষের অকল্যাণ, কষ্ট ও অশান্ড়ি। আর একথাটিই প্রকৃত সত্য।

আল-াহ মানবজাতিকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করে সাথে সাথে তাঁর আনুগত্যের বিধান অবতীর্ণ করেছেন। এই বিধানে মানুষের কিসে কল্যাণ, আর কিসে অকল্যাণ, কল্যানের পথে কি ভাবে চলতে হবে এবং অকল্যাণ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে তা পরিষ্কার করে লিপিবদ্ধপূর্বক তাঁর মনোনীত বান্দার মাধ্যমে পৃথিবীবাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন। আল-াহর এসব বান্দা আল-াহর বানী সম্বলিত বিধান মানব জাতির নিকট উপস্থাপন এবং সে মোতাবেক আল-াহর বিধান (দ্বীনে হক) জারীর ব্যবস্থা করেছেন। আল-াহ বলেন ঃ "তিনিই আপন রসূলকে হেদায়েত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি সমগ্র দীনের (আইনের) উপর তাকে বিজয়ী করে তুলতে পারেন।" মায়েদা : ৩

মানব জাতির আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অতীতের কোন মানব জাতির আইন এই সত্য বিচ্যুত ছিল না। পাক ভারত উপ-মহাদেশের মানব সম্প্রদায়ের আইনের বিষয়টি বিবেচনা করলে এ কথার সত্যতা মিলে। এ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের ধর্মই ছিল আইনের একমাত্র উৎস। এখানে ধর্ম হলো আইন। যে আইন জনগণ অবলম্বনপূর্বক জীবন নির্বাহ করতো। এ ধর্ম বা আইন ছিল সৃষ্টিকর্তা থেকে আগত। বেদে তা সন্নিবেশিত ছিল। এ আইনে মানুষের জীবনের কোন খন্ডগত পার্থক্য রচনা করা হতো না। আইনের মাধ্যমে সমাজের মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা হতো। সমষ্টি, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াদি একই আইন বা ধর্ম দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো।

অনুরূপভাবে ইহুদী ও খৃষ্টান জাতির আইনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ধর্মই ছিল এসব জাতির আইনের একমাত্র উৎস। তাদের ব্যক্তিক ও সামাজিক বিষয়াবলী তাই আইন অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আল-াহর তরফ থেকে অবতীর্ণ আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। এসব আইন ছিল যেমন পরম সত্য থেকে আগত, তেমনি ইনসাফপূর্ণ। অতঃপর এসব ধর্ম তথা আইনে ধর্মীয় নেতাগণ তাদের মনগড়া স্বার্থানুগ অনেক বিষয়াদি সংযোজন বা বিয়োজন করায় উহা আর সঠিক অবস্থায় থাকেনি। সপ্তম শতকের দিকে মুসলমানদের মাধ্যমে ইসলামী অর্থাৎ আল-াহ প্রেরিত সর্বশেষ বিধান পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় সমাজে ইসলামের এই মহান বানী তখনও পৌছায়নি বা তারা গ্রহণ করেনি। খৃষ্টান পাদ্রীরা তখন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তারা ধর্মের নামে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে রাজত্ব করছিল। তারা খোদার নামে নিজেদের মত চালু করত। তারা ধর্মের নামে মানুষের নিকট নিরংকুশ আনুগত্য দাবী করত। জীবনের প্রত্যেক দিকে প্রভাব বিস্ড়ব করতে গিয়ে তারা সকল বিষয়েই নিজেদের মতামত জোর করে চাপিয়ে দিতো। জনগণের উপর চরম যুলুম নির্যাতন চালাতো। এতে সমাজের জ্ঞানীদের মাঝে উহার বির"দ্ধে প্রচন্ড বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়। এই বিদ্রোহ শেষে দ্বন্দ্বে রূপ নেয়, যা প্রায় দু'শত বছর যাবত অব্যাহত থাকে। শেষে স্বৈরাচারী পাদ্রীদের পরাজয় ঘটে এবং জনগণের জয় হয়। উভয়ের মাঝে ধর্মীয় বিধান নিয়ে একটা আপোষ হয়। আপোষের মোদ্দা কথা ছিল এই যে, ধর্ম কেবলমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং উহার নেতৃত্ব দেবে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। কিন্তু সমাজের পার্থিব জীবনের সকল দিকের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ড় থাকবে। পার্থিব কোন বিষয়েই চার্চ বা ধর্মীয় নেতার কোন প্রাধান্য পাবে না।

বস্তুতঃ এখান থেকে প্রাশ্চাত্য তথা ইউরোপে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা হয়ে যায়। রাষ্ট্র ধর্মকে বাদ দিয়েই নিজেদের ইচ্ছে মত আইন প্রণয়ন শুর" করে। যাকে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularinm. উহা মানব জীব অখন্ড জীবনকে বাহ্য ও নৈতিকতার দু'টি খন্ডে বিভক্ত করে। উভয়ের মাঝে বিরাট মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছে।

আরব বিশ্বসহ অর্ধ পৃথিবী মুসলিম শাসনাধীন থাকায় এসব দেশে ইসলামই ছিল একমাত্র আইন। আইন হিসেবে ইসলাম সত্য ও ইনসাফপূর্ণ। এখানে আইন ও নৈতিকতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আ"ড়র্জাতিক জীবন ব্যাপী এ আইন পরিব্যাপ্ত।

জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে ইউরোপ মুসলিম জাহান সহ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র দখলপূর্বক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের আইন প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে এসব রাষ্ট্র থেকে ইসলামী আইন তিরোহিত হয়। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত এবং ক্ষেত্রবিশেষে পারিবারিক জীবনে উহার অনুশীলন অব্যাহত থাকে। বর্তমানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটলেও তাদের আইন (Positive law) এসব রাষ্ট্রে বহাল রয়েছে।

Postive Law-এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে Man is the measure of all things, অর্থাৎ মানুষই তাদের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করবেন। এখানে নৈতিক তথা সৃষ্টিকর্তার কোন ভূমিকা বা এখতিয়ার নেই। মানুষ নিজেদের মতে প্রয়োজনীয় বিধি বিধান প্রণয়ন করে নিজেরা চলবে এবং অপরকেও চালাবে। তারা যেটিকে ন্যায় বা সত্য মনে করবে সেটি সত্য বা ন্যায় হিসাবে গ্রাহ্য হবে, অন্য কোন কিছু নয়। আর এটি আইনের শাসনের স্থলে আইন দ্বারা যুলুমের শান প্রতিষ্ঠার ডাগায়কে সুগম ও প্রকাস্থ করেছে। বর্তমান বিশ্বে আমরা যারা নির্মম শিকার।

২। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ঃ

প্রতিটি রাষ্ট্রীয় সমাজে, রাষ্ট্রীয় সমাজের জন্য প্রণীত আইন, বাস্ড়বায়নের জন্য একটি জনশক্তি কাঠামো থাকে। এই জনশক্তি কাঠামো পরিচালনার জন্য যে প্রক্রিয়া অনুসৃত হয় উহাই মূলত রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া (State Adminitration Management process)। বলতে কি, এই ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার ফলপ্রসূতার উপর নির্ভর করে সংশি-ষ্ট রাষ্ট্রের গৃহীত আইন বাস্ড়বায়নের গতি প্রকৃতি ও মান। সাধারণতঃ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার কার্যাবলীকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক. পরিকল্পনা (Planning)
খ. সংগঠন (Organization)
গ. জনশক্তি নিয়োগ (Staffing)
ঘ. নির্দেশনা (Directing)
ঙ. নিয়ন্ত্রণ (Controlling)

ক. পরিকল্পনা (Planning) ঃ

রাষ্ট্রে আইন বাস্ড়বায়নের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্য-সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে কিভাবে জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ করা যায়, সে জন্য ব্যবস্থাপনার অবশিষ্ট চারটি কার্যক্রম কি উপায়ে সফলতার সাথে সম্পাদন করা আবশ্যক সে বিষয়ে আগাম চিন্ড়া ও সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করাই হলো পরিকল্পনার প্রধান কাজ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার গুর"ত্ব প্রভূত। এক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় হলে গোটা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া বিঘ্নিত

হবে এবং তজ্জন্য প্রকৃত আইনের শাসন কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এজন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনার কাজটি অভিজ্ঞ ও পন্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদন করা সমীচীন। পরিকল্পনার কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে অবশিষ্ট কার্যক্রম সম্পাদনে তেমন কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। এক্ষেত্রে 6W+H নীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। [6W=What, who, when, where, whom, why এবং H=How] ব্যবস্থাপনা পন্ডিতগণ সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এ নীতিমালা অনুসরণ করে থাকেন।

খ. সংগঠন (Organization) ঃ

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় গুর"ত্বপূর্ণ কাজ সংগঠন। সাধারণ অর্থে সংগঠন হলো নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনার্থে প্রয়োজনীয় মানব ও বস্তু সম্পদের একত্রিতকরণ ও বিন্যাস সাধন। সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কার্যাবলীকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা, প্রত্যেক কর্মীর কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব চিহ্নিতকরণ ও বন্টন এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যে সংগঠন অর্থাৎ রাষ্ট্রের কার্যকর প্রশাসন যন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটির গুর"ত্ব প্রভূত। কেননা এরই মাধ্যমে আইনে শাসন প্রতিষ্ঠায় কে কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং তাতে কার কি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হবে তা নির্ধারিত হয়। সংগঠণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিতব্য কার্যাদি সনাক্তকরণ ও তা বিভক্তিকরনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা হয়।

সংগঠনের রূপরেখা প্রণয়নের ক্ষেত্র সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, যাতে কর্তব্য ও কর্তৃত্বের মাঝে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হয়, কোনরূপ অসামঞ্জস্যতার অবতারণা না ঘটে। তা না হলে সংগঠনের কার্যক্রমে কতৃত্বের লড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়ে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনকে বাঁধাগ্রস্থ করে তুলবে।

গ. কর্মী সংস্থান (Staffing) ঃ

আইনের শাসন ব্যবস্থাপনায় সৃষ্ট পদে যোগ্য জনশক্তি নিয়োগ এবং তদসম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদনকে কর্মী সংস্থান বলে। কর্মী সংস্থানের যে সব কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়; তাহলো ঃ

১. প্রতিটি চিহ্নিত কাজে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ ব্যক্তি বা কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
২. নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ পত্র দান ও ন্যায্য বেতন বা পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৩. নিয়োগ কালে কর্মীদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণী সংগ্রহ ও তা সংরক্ষণ যাতে কর্মকালীন সময়ে কোন কর্মী দুর্নীতির মাধ্যমে অধিক বিত্তশালী হতে না পারে, সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হয়।

বলতে কি, বর্তমানে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নৈতিকতা ও সততার বিষয়টি বিবেচনায় না এনে কেবল যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগ দান করায় প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি ব্যাপক ভাবে পরিশীলিত হচ্ছে। এতে জনগণ আইনের শাসনের সুফল হতে বঞ্চিত হয়ে যুলুমের শিকার হচ্ছে। বস্তুতঃ একারণে প্রকৃত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কর্মীদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে সাথে তাদের নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ড়তার দিকটি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা আবশ্যক। কেননা অসৎ লোক দিয়ে সদাচরণ প্রত্যাশা করা বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে?

ঘ. নির্দেশনা (Directing) ঃ

নির্দেশনা হলো পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগঠনের কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য কর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ প্রদান কৌশল। নির্দেশনা এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিভিন্ন সময় কর্মীদেরকে প্রয়োজনীয় আদেশ, উপদেশ, পরামর্শ, যোগাযোগ, নেতৃত্ব ও প্রেষণার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জিত হয়।

এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠনের অধীনস্থ কর্মীদেরকে তাদের কর্মসম্পাদনকে সাধারন লক্ষ্যে পরিচালিত করা হয়। এটি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। তা ছাড়া কোন সংগঠন স্বীয় লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না।

নির্দেশনার ক্ষেত্রে সাধারনতঃ নিম্মোক্ত নীতি সমূহ অনুসৃত হয়ে থাকে ঃ

১. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্যনীতি
২. আদেশের ঐক্যনীতি
৩. ফলপ্রসু যোগাযোগ নীতি
৪. গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের নীতি
৫. প্রেষনার নীতি, ও
৬. যথাযথ অংশ গ্রহণনীতি অর্থাৎ পরামর্শ নীতি।

উপরোক্ত নীতি সমূহ অর্জনে প্রধানতঃ নিম্মোক্ত কৌশল সমূহ পরিশীলিত হয় ঃ

১. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্যের নীতির প্রেক্ষিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ;
২. আদর্শ নেতৃত্ব অনুসরন কার্যক্রম অবলম্বন;
৩. কর্মে প্রেষণা সৃষ্টিমূলক নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ ও
৪. অংশগ্রহণ মূলক কৌশল অবলম্বন।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত জনশক্তির অব্যাহত নৈতিক ও কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান অপরিহার্য। এছাড়া প্রকৃত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

মানুষের জীবনে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুর"ত্ব অসীম। কেননা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মানুষকে তার নিজের ও সমাজের যথার্থ চাহিদা পূরণের উপযোগী করে বিকশিত, ও শৃঙ্খলিত (Disciplined life lead) যোগ্য করে তোলে। মানুষের জীবন সাংগঠনিক বিন্যাস প্রকৃতির। প্রতিটা সংগঠনে দু'ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থাকা অপরিহার্য। একটি নৈতিক এবং অপরটি কর্মের। এ দু'টি কর্মসূচীর যে কোন একটি বাদ দিয়ে কোন কর্মসূচী অবলম্বন করলে তা দ্বারা প্রত্যাশিত ফলাশা করা দুরাশারাই নামান্ড়র। কেননা এ দু'টি বিষয় অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত নীতিকে বাদ

দিয়ে কর্ম বিশৃংখলা, যা কখনো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের কাজে আসে না বরং ক্ষতিরই কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ কর্মছাড়া নীতি বাস্ড়বতা বর্জিত অকর্ম্য জীবন এবং যা বোঝা স্বরূপ।

নীতি হলো মানুষের জীবনে সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দেশিত চলার পথ। নির্দেশ অর্থাৎ মানুষ তার জীবনের সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কিভাবে চলবে তার একটি গাইড লাইন। একটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি ছাড়া পৃথিবীর কোন প্রাণী বা বস্তু চলতে পারে না এবং চালানোও যায় না।

নৈতিকতা হলো জীবনকে সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলার নীতি বা গাইড লাইন যে প্রেক্ষিতে চলার অঙ্গীকার এবং দৃঢ়তা অবলম্বন।

সে জাতির শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ যেরূপ সে জাতির জনগণের বা সদস্যদের জীবনবোধ ও নীতিজ্ঞান সেরূপ।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের মানুষের সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে জীবনের মূল্যবোধ নির্মাণের জ্ঞান দান করে। আর এই জ্ঞানের প্রকৃতি তাত্ত্বিকমূলক (Theoritical)| মানুষ জীবন বোধের এ তাত্ত্বিক জ্ঞান নিয়ে যখন কর্মজীবনে অনুপ্রবেশ করে তখন তাকে ঐ সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে চলার জন্য প্রয়োজন হয় নৈতিক ও কর্মভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যা কোন সংগঠনের একজন কর্মীকে নিজ জীবন, স্বীয় সংগঠন ও জাতির প্রয়োজনীয় ও সমৃদ্ধ জ্ঞান দক্ষতা ও আচরণ তথা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করে।

কোন সংগঠনের কোন কর্মীর নৈতিক ও কর্মভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্বরূপ যেরূপ হবে, সেই সংগঠনের সেই কর্মীর সম্পৃক্ত কর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি সেরূপ বৈশিষ্ট্য মন্ডিত হব। এখন যদি কোন সংগঠন নৈতিক ও কর্মভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনুক্রমের মধ্যে যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক অনুক্রম অবলম্বন করে, তাহলে সে সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন আদৌ সম্ভব নয়। নৈতিকতা বাদ দিয়ে কোন কর্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারা যে কর্মী তৈরি হবে, তারা হবে দুর্নীতিপরায়ণ, দায়িত্বকে সে কখনো আমানত হিসেবে গ্রহণ করবে না। বরং কর্মকে যোগ্যতা বলে জীবন ও জগতটাকে ভোগ করার সুযোগ ও সুবিধা হিসেবে গ্রহণ করবে। এই ধরনের কর্মী দ্বারা সংগঠনের সব ধরনের অপকর্ম সম্পাদন সম্ভব। অন্যদিকে যদি ঐ কর্মীকে কেবল নৈতিকতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাহলে ঐ কর্মী সংগঠনের চাহিদা অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে অসামর্থ হওয়ায় তাকে কর্ম থেকে অব্যহতি বা বরখাস্ড় করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত অগ্রগতি ও উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় কর্মভিত্তিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এ ক্ষেত্র তেমন কোন সমস্যা নেই। বর্তমান সমস্যা নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে। আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বে প্রশাসনে যত দুর্নীতি ও বিপর্যয় তার মূলে নৈতিক সমস্যাই প্রধান।

বর্তমান বিশ্বের নৈতিকতার দু'টি দর্শন বিদ্যমান। একটি ইসলামী এবং অপরটি পাশ্চাত্য। এ দু'টি নৈতিকতার দর্শন পরস্পর বিপরীত। নিম্নে সংক্ষেপ এ দু'টি নৈতিক দর্শনের স্বরূপ উলে- খ করা হলো ঃ

ইসলামী নৈতিকতার দর্শন ঃ ইসলামের নৈতিকতার দর্শন গভীর, সদা কার্যকর এবং বিশ্বমানবতার সর্বাধিক কল্যাণ কর। ইহা চরম ও পরম সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর নীতিও কৌশলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এ সম্পর্কে আল-াহ পাক বলেন ঃ "হে মানুষ! তোমরা যারা আল-াহর উপর ঈমান এনেছো, একমাত্র আল-াহকেই ভয় করো, এবং সদা-সর্বদা তার নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে তোমরা আল-াহর পথে চেষ্টা সংগ্রাম করো। এ পথে চললেই তোমরা সফলতা লাভ করতে পারবে।" – সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৫

"হে মানুষ, তোমরা যারা (আমার উপর) ঈমান এনেছো, তোমরা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ধৈর্য্য ধারণ করো এবং কখনো তোমাদের ধৈর্য্যকে পরিশ্রান্ড় হতে দিও না বরং অন্যায় অসত্য বাতিলের মোকাবিলায় ধৈর্য্য ধারণের সময় একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো, ঈমানের দাবীতে সদা সুদৃঢ় থেকো। সর্বোপরি জীবনের সকল কাজে একমাত্র আল-াহকেই ভয় করো, আশা করা যায় তোমরা একদিন সফলকাম হতে পারবে। [– আলে ইমরান ঃ ২০০]

"অবশ্যই (হালাল-হারামের) বিষয়ে আল-াহকেই ভয় করো। আল-াহতায়ালা দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" – আল মায়েদা ঃ ৪

তোমরা সর্বাবস্থায় আল-াহ তা'আলাকে ভয় করো; অবশ্যই আল-াহ তাআলা তোমাদের সকল কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।" – আল মায়েদা ঃ ৮

উপরোক্ত আয়াত গুলো হতে পরিষ্কার প্রতীয়মান যে, কেবলমাত্র আল-াহ ভয়-ই ইসলামী নৈতিকতার তথা মূল্যবোধের একমাত্র হাতিয়ার।

এখন প্রশ্ন ঃ কেন আল-াহর ভয় নৈতিকতার ভিত্তি? এ প্রশ্নের জবাব হলো আল-াহ মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থায় মানুষের সাথী। তাই কোন মানুষের পক্ষে একটি মুহূর্তও আল-াহর অগোচরে অবস্থান করা সম্ভব নয়।" আল-াহ মানুষকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, যে উদ্দেশ্য মাফিক কাজ করছে কিনা তা সর্বাগ্রে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করছেন। মানুষ আল-াহর আনুগত্যমূলক কাজ করলে আল-াহ পাক সন্তুষ্ট হন। আর আনুগত্য বিরোধী কাজ করলে অসন্তুষ্ট হন বা রাগ করেন এবং তজ্জন্য শাস্ড়ির ব্যবস্থা করেন। বস্তুত এজন্য মানুষকে আল-াহর ভয় থেকে রক্ষা পেতে হলে আল-াহ কিসে সন্তুষ্ট এবং কিসে অসন্তুষ্ট হন তা জেনে নিয়ে সে মোতাবেক চললে মানুষের এই পৃথিবীর জীবন সফল।

আল-াহকে ভয় করলে সর্বাবস্থায় মানুষ মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে। মানুষ অনেক এমন অন্যায় কাজ করে যা কেউ দেখতে পায় না, তখন আল-াহ দেখতে পান। তাই এই আল-াহর ভয়ই মানুষকে অন্যায় বা দুর্নীতিমূলক আচরণ থেকে বিরত রাখতে কার্যকরভাবে সহায়তা করে।

কুরআন হলো আল-াহর বিধান, যাতে কিসে অন্যায় এবং কিসে ন্যায় তা সুবিস্ড়রিত বিধৃত হয়েছে। এই বিধানকে জেনে নেয়ার নামই হচ্ছে ঈমান এবং এসব বিধান তোমাবেক জীবনের সব কিছুর ফয়সালা করার নামই হচ্ছে ইসলাম। তাই ইসলামই একমাত্র নৈতিকতার বিধান। বস্তুত এজন্যই কোন জাতীর বা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি প্রতিরোধ পূর্বক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা তথা সাফল্য তথা উৎপাদনশীলতা অর্জনে কর্মের জ্ঞানের সাথে সাথে ইসলামিক জ্ঞান শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য। কেননা ইসলাম এমন একটি আত্মসচেতনতা যা একজন মানুষকে ন্যায় ও অন্যায় জেনে বুঝে ন্যায়ের পথে প্রতিষ্ঠিত থেকে চলতে সহায়তা করে। ইসলাম মানুষের মনকে আল-াহর সাথে সংযুক্ত করে, মানুষের চরিত্র ও মূল্যবোধকে আল-াহর মানদন্ড অনুসারে অর্থাৎ আল-াহর রঙ্গে রঙ্গীন করে গড়ে তোলে, যাতে একজন মানুষ কখনো সত্যচ্যুত হয়ে দুর্নীতির ন্যায় অসদাচারণ করতে না পারে। যার ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্ড়রায় সৃষ্টি হয়।

পাশ্চাত্য নৈতিকতার দর্শন ঃ পাশ্চাত্য তথা অনইসলামিক বা ইসলামহীন নৈতিকতার দর্শন নির্ণয় খুবই কঠিন ও জটিল। কেননা এর কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা নেই। গত শতাব্দীতে Amcriean Ethical Union নৈতিকতা সম্পর্কিত একটি নৈতিক আন্দোলন শুরু করেছিল, যা বিশ্বের

অনেক রাষ্ট্রের জনগণকে প্রভাবিত করে। এ প্রেক্ষিতে ব্রিটেনের Union of Ethical Societies নামে পৃথক আর একটি প্রতিষ্ঠান নৈতিকতা আন্দোলন শুর করে। পরে অবশ্য ব্রিটেনের Ethical Society আমেরিকান Ethical Union একত্রিত হয়ে আন্দোলনের কাজ করতে থাকে।

এই Ethical Union নৈতিকতা সম্পর্কে একটি দিক নির্দেশনা তথা রূপরেখা পেশ করেছে। যার ভিত্তিতে তারা তাদের নৈতিকতা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের নৈতিকতার রূপরেখার প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঃ

"মানব সেবা ও মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য এমন পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া, যা এই নীতির ভিত্তিতে হবে। যেমন-

প্রথমত ঃ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সম্প্রীতি;

দ্বিতীয়ত ঃ নৈতিক ধারণা ও নৈতিক জীবনের জন্য দুনিয়ার তাৎপর্য এবং মৃত্যের পরের জীবন সম্পর্কে কোন আকিদা বিশ্বাসের দরকার নেই এবং

তৃতীয়ত ঃ নিছক মানবিক ও প্রাকৃতিক উপায় উপাদানের মাধ্যমে জীবনের যাবতীয় সম্পর্কের সত্যপ্রীতি, সত্যকে জানা এবং সত্যের জন্য কাজ করে যাবার মতো করে তৈরি করা।

উপরোক্ত নীতিতে সৃষ্টিকর্তা আল-াহকে বিশ্বাস ও ধর্মকে নৈতিকতা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে নিয়েছে। এই ধর্মহীন দর্শন এবং প্রকৃত নৈতিক দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়ের পার্থক্য আকাশ-পাতাল। এই নৈতিক দর্শনের স্বাভাবিক ও যৌক্তিক জিজ্ঞাসা তিনটি ঃ

প্রথমত ঃ প্রকৃত এবং চরম সৎ কি, যার সাথে পরিচিত হওয়া মানুষের চেষ্টা ও কর্মের লক্ষ্য হবে। এবং এরই মানদন্ডে মানুষের কার্যক্রম যাচাই করে উহার ভাল-মন্দ বা ভুল-নির্ভুল মূল্যায়ন করা যায়?

দ্বিতীয়ত ঃ ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ সম্পর্কে জানার বা অবগত হবার মাধ্যম কি? কেননা ভাল কি, মন্দ-কি, সৎ কি, অসৎ কি, ভুল কি, নির্ভুল কি- ইত্যাদি বিষয় জানার জন্য অবশ্যই কোন না কোন উৎস থাকতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সত্য-অসত্য নীতির কার্যকারিতার পেছনে কোন শক্তি সক্রিয় ভূমিকা রেখে থাকে, যার ভিত্তিতে একজন ব্যক্তি সৎ কাজ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকবে?

প্রকৃত নৈতিক দর্শন, যার উপর ভিত্তি করে নৈতিকতার অট্টালিকা নির্মিত হয়, নৈতিকতা যাচাই বা পরীক্ষার যে মানদন্ড পেশ করেছে। সে প্রেক্ষিত পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনের যে স্বরূপ পাওয়া যায় তা হলো ঃ

প্রথম ঃ আসল এবং চরম সৎ কি, যা কিনা নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের ভিত, যার মানদন্ডে মানুষের কার্যকলাপ যাচাই করে ভালো-মন্দ বা ভুল-নির্ভুল নির্ণয় করা হয়?

এ প্রশ্নের জবাবে নৈতিক দর্শন কোন সুনির্দিষ্ট একটি জবাব দিতে পারেনি। এদের একদল বলে আনন্দই সেই সৎ। আর একদল বলে পূর্ণতা এবং তৃতীয় দল বলে কর্তব্য। এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। যেমন-

আনন্দের কথাই বলি- কোন ধরনের আনন্দ? দৈহিক কামনা ও ইন্দ্রের কামনা বা মানসিক উন্নতি লাভের পর প্রাপ্ত আনন্দ? আবার কার আনন্দ প্রত্যেকের, না নিজের, সমগ্র মানব জাতির, না অন্যের আনন্দ?

এরপর আসে পূর্ণতার বিষয়ে। পূর্ণতা কি, এর মানদন্ড কি, এর লক্ষ্য কি? এর কোন সুনির্দিষ্ট জবাব নেই। কেউ বলে পূর্ণতা ব্যক্তির, কেউ বলে দলের, আবার কেউ কেউ বলে মানব জাতির। কোনটি সঠিক তার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা নেই।

অতঃপর ধরি কর্তব্যই সৎ বা অসত্যের মানদন্ড। এখন প্রশ্ন ঃ এ কর্তব্য কার প্রতি? নিজের প্রতি, দলের প্রতি, জাতির প্রতি, না মানবতার প্রতি? কর্তব্যের বিধান কি? কে সে বিধান প্রণয়ন করল ইত্যাদি বিষয়ের কোন সুনির্দিষ্ট জবাব এদের নেই।

দ্বিতীয়ত ঃ যে নৈতিকতা বিধানের কথা পাশ্চত্য দর্শন বলে থাকে, তার উৎস কি? এ প্রশ্নের ও সুনির্দিষ্ট কোন জবাব নেই। বিভিন্ন জন বিভিন্ন উৎসের কথা বলেছেন। যেমন কেউ কেউ বলেন, মানুষের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা, জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কিত অর্জিতজ্ঞান; কেউ বলেন বিবেক, কেউ বলেন বুদ্ধি ইত্যাদি। এর কোন নির্দিষ্ট মানদন্ড নেই। যে যেমন মনে করে সেটিই তার নৈতিকতার উৎস।

তৃতীয়ত ঃ যে নৈতিকার কথা পাশ্চত্য নৈতিক দর্শনে বলা হয়েছে বা হচ্ছে তা কার্যকরীকরণের শক্তি কি? এর জবাবেও তাদের কোন সুনির্দিষ্ট বক্তব্য নেই। এক একজন এক এক ধরনের শক্তির কথা বলেছেন। যেমন-কেউ কেউ বলেন যে সবগুণ মানুষকে আনন্দ ও পূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়, উহার আনুগত্য করার শক্তি তারা নিজেরাই। অন্যদিকে আর একদল বলেন, মানুষের সুসংহত ইচ্ছাশক্তি কর্তৃক তা নিয়ন্ত্রিত ও প্রকাশিত হয়। অপর একটি দল বলেন, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইহার নিয়ামক। আবার অন্য একটি দল সমাজকে ইহার নিয়ামক শক্তি হিসেবে উলে-খ করেছেন? এখন প্রশ্ন ঃ কোনটি ইহার প্রকৃত নিয়ামক শক্তি, যার ভিত্তিতে ইহা কার্যকরী হয়ে থাকে?

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, পাশ্চাত্যের নৈতিক দর্শন নিছক একটি কল্পনা মাত্র। এর কোন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নেই। নেই কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা। ইহা মানুষকে চরম প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের দ্বারা মানুষের উপর জুলুম, নির্যাতন হিংসা বিদ্বেষ ইত্যাদি যাবতীয় অমানবিক কর্মকান্ডকে বৈধতা দান করা ছাড়া আর কিছুই করে না। এহেন অবস্থায় বর্তমান দুনিয়া একটি সর্বব্যাপী নৈতিক নৈরাজ্যের মধ্যে অবস্থান করছে। পাশ্চাত্য দুনিয়া আজ পর্যন্ত ভালো ও মন্দ, সৎ ও অসৎ সম্পর্কে নির্ভুল কোন উৎসের উন্নত ও সার্বজনীন বিধান প্রবর্তন করার মতো শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়নি। নৈতিকতার এহেন দুর্বলতার কারণে বর্তমান পাশ্চাত্যের নৈতিক দর্শন কোন শক্তিশালী চরিত্র গঠন করতে পারেনি।

সত্য কথা বলতে কি, পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শন নৈতিকতার আলোচনা যেখান থেকে শুর করেছে, আসলে তা প্রারম্ভিক পয়েন্ট নয়, বরং এটি মাঝখানের একটি পয়েন্ট মাত্র। এ দর্শনের সব থেকে বড় ভুল এটি। মানুষের সৎ বা অসৎ হবার প্রথম এবং প্রধান জিজ্ঞাসা হলোঃ এই পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা কি? অতঃপর অন্যান্য প্রশ্ন আসবে পরে। কেননা মানুষের মর্যাদার স্থান নির্দেশ ছাড়া মানুষের নৈতিকতার প্রশ্ন অনর্থক বা অকার্যকর।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। ধরন, আপনি একটি সম্পত্তি ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন। এখন আপনি এই সম্পত্তিটি কিভাবে ব্যবহার করবেন? কিভাবে উহা ব্যবহারের অধিকার আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে ব্যবহারের অধিকার আপনাকে দেয়া হয়নি অর্থাৎ যেভাবে আপনি উহা ব্যবহার করতে পারবেন না। এটি নির্ভর করবে ঐ সম্পত্তির সাথে আপনার সম্পর্কের ধরনের উপর। যদি উক্ত সম্পত্তির উপর আপনার একচ্ছত্র মালিকানা দেয়া হয় তাহলে আপনি উক্ত সম্পত্তি এক রকম অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করবেন। আর যদি তা না হয়ে

থাকে তবে উহা কখনোই নিজের ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবেন না। উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মালিকের অর্থাৎ যিনি আপনাকে উক্ত সম্পত্তিটি আমানত হিসেবে দিয়েছেন, তার নির্দেশনা মতো তা ব্যবহার করতে হবে।

এই পৃথিবীতে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা কি? মানুষ এ প্রশ্নের যে জবাব খুঁজে পায় উহার উপরই মূলতঃ মানুষের নৈতিকতার দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য নৈতিক দর্শনে এই পৃথিবীর সাথে মানুষের সম্পর্ক একচ্ছত্র মালিকানার মতো। মানুষ পৃথিবীকে যে রূপ ইচ্ছা যেরূপ ভোগ ব্যবহার করবে। এতে কোন বাধ্য প্রতিবন্ধকতা নেই। মানুষের মন যা বলবে সে তা-ই করবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষগুলো করছেও তা-ই।

অন্যদিকে ইসলামী নৈতিক দর্শনের মতে মানুষ এই পৃথিবীতে আল-াহর প্রতিনিধি মাত্র। সে এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ভোগ ব্যবহার করবে আল-াহ নির্দেশ মতো। নিজের ইচ্ছে মতো নয়। আর এটি ইবাদত।

আল-াহ মানুষের জন্য যা যা যতটুকু প্রয়োজন সব কিছুই পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরাদ্দ করেছেন। মানুষ আল-াহর প্রতিনিধি হিসেবে উহা আল-াহর ব্যবস্থাপনা নীতি ও কৌশল অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্বক তা প্রত্যেকেই প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ ব্যবহার করবে। এটি হলো মানুষের নৈতিকতার বিধান। এতে কোনরূপ দুর্নীতি করে সীমা লংঘণের অবকাশ নেই। আর এটি বর্তমান দুনিয়ায় আইনের শাসনের বড় অন্ড়রায়।

ঙ. নিয়ন্ত্রণ (Cmtrolling) :

ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার মৌলিক কার্যাবলীর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সর্বশেষ গুর"ত্বপূর্ণ কাজ। এটির গুর"ত্ব অপরিসীম। নিয়ন্ত্রণ হলো পরিকল্পনা অনুসারে সংগঠনের কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখা, মূল্যায়ন করা, বিচ্যুতি নির্ধারণ করা ও তা সংশোধন মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অব্যাহত বা অবিরাম প্রক্রিয়া।

পৃথিবীর সংগঠন সমূহ তাদের আদর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষা অর্জনে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকে।

ইসলাম তার আদর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে স্বীয় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছে। নিম্নে সংক্ষেপ উহার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

ইসলাম প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া

১ মানুষ প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া		২ আল-াহ প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	
১.১ প্রতিরোধ মূলক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	১.২ প্রতিকার মূলক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	২.১ ইহ জাগতিক প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া	২.২ পরকালে চূড়ান্ড় ফলাফল প্রদানে গৃহীত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া
১. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ২. কর্মকালীন অব্যাহত নৈতিক ও কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণ ৩. আল-াহর স্মরণমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ	১. কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি প্রণয়ন ও প্রবর্তন। ২. জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রবর্তন ৩. কর্মকান্ডের পর্যবেক্ষণ ও তদন্ড় ব্যবস্থা প্রবর্তন ৪. সংশোধন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ৫. শাস্ড়িমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন	১. শাস্ড়ি দিয়ে শিক্ষা দান ২. তওবা ও ক্ষমার মাধ্যমে ৩. ঈমানের পরীক্ষার মাধ্যমে ৪. কুরআনের মাধ্যমে ৫. জিহাদের মাধ্যমে	১. পৃথিবীতে সম্পাদিত আমলের তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ২. সংগৃহীত তথ্য মূল্যায়ন ৩. ফলাফল ঘোষণা ও তা যথাযথ ভাবে প্রদান

উৎস ঃ ড. মোঃ আনছার আলী খান, দুর্নীতি নিরসণে ইসলাম পৃ. ৭৬

এ পরিসরে সকল বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আমরা কেবল ইসলামে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব যা কিনা পৃথিবীর অন্যান্য ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ আলাদা। বলতে কি, একমাত্র ইসলামের জবাবদিহিতার বিধানই সর্বাপেক্ষা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে, তথা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অধিক কার্যকর। কোন কার্য প্রক্রিয়ার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রবর্তিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে জবাবদিহিতা একটি অতিব গুর"ত্বূর্ণ বিষয়। জবাবদিহিতার অনুভূতি ছাড়া কোন কার্যই উদ্দেশ্যানুগ অর্জিত হয় না। পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনার মধ্যে ইসলামী ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার গুর"ত্ব ও কার্যকর প্রভাব বিস্ড়রমূলক শক্তি সব থেকে বিস্তৃত ও ফলপ্রসু।

প্রশাসন তথা যে কোন ব্যবস্থাপনায় কর্মচারীর উপর অর্পিত কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করা তার কর্তব্য। এ কর্তব্যে অবহেলা বা গাফিলতি করলে এর জন্য সে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষ তার কৈফিয়ত তলব করতে পারবে।

আধুনিক ব্যবস্থাপনা ও ইসলামী ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার প্রকৃতি ও পরিধি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার দুটি তত্ত্ব বিদ্যমান ঃ (ক) পদসোপানিক তত্ত্ব এবং (খ) যুক্তিযুক্ততার তত্ত্ব। পদসোপানিক তত্ত্ব হলো সরকারী কর্মচারী বা আমলাকে জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল বা দায়িত্বশীল রাখার জন্য কতিপয় বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন। যেমন- আইন সভার প্রশ্নোত্তর, বাজেট অনুমোদন, সংসদীয় কমিটি, ন্যায়পাল গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রম পর্যালোচনা। আর যক্তিযুক্ততার তত্ত্ব হলো নৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে কর্মচারীদেরকে অনুপ্রাণীত করা। এটি কোথাও সামষ্টিক উদ্যোগেও হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এর অনুশীলন ঘটে, যার প্রভাব খুবই নগণ্য।

ইসলামের প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার ব্যবস্থা ত্রিমাত্রিক। যথা ঃ

১. প্রশাসনিক পদসোপান ভিত্তিক-এতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ অধঃস্ড়নদের কার্যকলাপ পরিদর্শনের মাধ্যমে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করে থাকে।

২. সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহিতা। অর্থাৎ কোন জনসমাগমের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বির"দ্ধে জনগণের অভিযোগ শ্রবন ও উহার প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। ইসলামী ব্যবস্থাপনায় এর ব্যাপক অনুশীলন দৃষ্টান্ড় বিদ্যমান।

৩. শেষ বিচারের দিন আল-াহপাকের নিকট জবাবদিহিতার চেতনা সমুন্নত রাখার মাধ্যমে জবাদিহিতার ব্যবস্থাপনা। এটি সব থেকে ফলপ্রসু জবাবদিহিতার ব্যবস্থাপনা যা কিনা অন্য কোন ব্যবস্থাপনাতে নেই। এটি ইসলামী ব্যবস্থাপনার মূল Spirit.

১. পদসোপানিক ভিত্তিক জবাবদিহিতা ঃ প্রতিটি সংগঠনের বিন্যাস ধারা পদসোপানিক ভিত্তিক। পদসোপান বলতে কর্মচারীদের অধঃস্ড়ন সম্পর্ককে বুঝায়। যার ভিত্তিতে ঊর্ধ্বতন কর্মচারী কর্তৃক অধঃস্ড়ন কর্মচারীদের উপর নির্দেশনা প্রদানের আইনানুগ অধিকার সৃষ্টি হয়। ইসলামে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে যা গ্রেডের কর্তৃত্ব স্বীকৃত। ইসলাম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আল-াহর প্রতি এবং রসূলুল-াহ স.-এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের আদেশ করেছে এবং প্রশাসনিক নেতৃত্বকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছে। আল-াহ বলেন -

"হে বিশ্বাসীগণ! আল-াহকে মান্যকর, তাঁর রাসূলকে মান্য কর এবং মান্য কর তাদেরকে যাদের উপর কর্তৃত্ব অর্পিত হয়েছে। কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে মতভেদ ঘটলে সে বিষয় আল-াহ ও রাসুলের নিকট উপস্থাপন কর। (আল কুরআন, সূরা নিসা ঃ ৫৯)।

এই প্রসঙ্গে রসূলুল-াহ স.-এর একটি হাদিস প্রনিধানযোগ্য। রসূলুল-াহ স. বলেন ঃ তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"

প্রতি সরকারী কর্মচারীর দায়িত্ব হলো জনগণের আমানতসমূহ সুষ্ঠু ও ইনসাফপূর্ণভাবে ব্যবস্থাপনা করা। এই প্রসঙ্গে মহান আল-াহ বলেন ঃ

"নিশ্চয় আল-াহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন, তোমরা যেন আমানত সমূহ তার মালিককে যথাযথভাবে ফেরত দাও।" - আল কুরআন।

রসূলুল-াহ স. বলেন- যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই। রসূলুল-াহ স. আরো বলেন ঃ খিয়ানত দারিদ্য ডেকে আনে"। আল হাদিস। এটি যে কত বাস্ড়ব সত্য, বর্তমান বিশ্বের দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ান রাষ্ট্রগুলোর অর্থনেতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে তা সহজে উপলব্ধি করা যায়। যে দেশে দুর্নীতির চর্চা যত বেশী, সে দেশ তত দরিদ্র।

জবাবদিহিতার অনুভূতি আমরা হযরত ওমর ফার"ক রা.-এর উক্তি থেকে উপলব্ধি করতে পারি। তিনি বলেছিলেন ঃ সুদূর তাইগ্রীস নদীর তীরে কোন একটি কুকুরও যদি মারা যায়, তাহলে আল-াহর দরবারে ওমরকে তার জন্য শেষ বিচারের দিন (আল-াহর কাছে) জবাদিহি করতে হবে।"

২. সরাসরি জনগণের নিকট জবাবদিহিতা ঃ ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় প্রতিটি নাগরিকের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এ জন্য রাষ্ট্রের কোন কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত কোন কর্মচারী যদি দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়, তাহলে উহার বির"দ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করা প্রত্যেকটি নাগরিকের নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য। ইসলামী ব্যবস্থাপনার দর্শন হলোঃ কেউ দুর্নীতি করবে না, তেমনি কাউকে দুর্নীতি করতে দেবে না।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় এ নীতির চর্চা ব্যাপক এবং অধিক কার্যকর। এই প্রসঙ্গে আমরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফার"ক রা.-এর শাসন আমলের নিদর্শন স্মরণ করতে পারি।

হযরত ওমর রা. মসজিদে নববীতে ইমামতি করতেন। এটি ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য যে, যিনি রাষ্ট্রের খলীফা বা আমীর হবেন তিনি রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মসজিদে ইমামতি করবেন। এটিই ইসলামের ঐতিহ্য।

একদিন হযরত ওমর মসজিদে নববীতে খুতবা দিতে উঠেছেন। ঐ জামাতে উপস্থিত গ্রামের এক দরিদ্র ব্যক্তি হযরত ওমরকে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন এবং দৃঢ় ভাষায় বলেন -

"হে ওমর! আমি আপনার খুতবা শুনব না এবং আপনার প্রতি আনুগত্য দেখাব না যতক্ষণ না আপনি আপনার পরিহিত জামার কাপড় সম্পর্কে জবাবদিহি না করেন। গতকাল আপনার পক্ষ থেকে যে কাপড় আমাদের মাঝে বণ্টন করা হয়েছে তা দিয়ে আপনার গায়ের এত বড় লম্বা জামা বানানো কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আপনি আমাদের চেয়ে বেশি কাপড় না নিলে কিভাবে আপনার জামা এত লম্বা হওয়া সম্ভব হলো?"

ঐ ব্যক্তির জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হযরত ওমর রাগান্বিত হলেন না এবং তাকে ধমকও দিলেন না। মজলিসের কোন ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে থামানো তো দূরের কথা, ভর্ৎসনা পর্যন্ড় করেননি। বিশ্ব মুসলিম জাহানের খলীফা একজন (বেদুইনের) জিজ্ঞাসাবাদের কাঠ গড়ায় দাঁড়ান। বিশ্ব জাহানের খলিফার জবাবদিহিতর নমুনা দেখে সবাই থমকে গেল বটে। কিন্তু ধন্য হলো বিশ্বজাহান। ওমর রা. নিচু স্বরে নিজের পুত্র আবদুল-াহর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। হযরত আবদুল-াহ বললেন ঃ মদীনার সকল নাগরিকদের মতো আমি ও আমার পিতা এক এক খন্ড করে দুইজনে দু'খন্ড কাপড় পেয়েছিলাম। আমার পিতা দীর্ঘকায় হওয়ায় প্রাপ্ত কাপড় দ্বারা তাঁর কোনক্রমেই জামা তৈরি হচ্ছিল না। তাই আমি আমার ভাগে প্রাপ্ত কাপড় তাকে দিয়ে দুইজনের কাপড় একত্র করে তাঁর ঐ জামা তৈরি করা হয়েছে। তার একার কাপড় দিয়ে নয়।"

মুক্তি পেলেন মুসলিম জাহানের খলীফা। বেদুঈন অত্যন্ড় খুশী হয়ে বললেন, হে ওমর রা. আপনি আপনার খুতবা অবিচ্ছন্নভাবে চালিয়ে যান। এখন আমি খুতবা শুনব। আমি আপনার প্রতি আনুগত্য দেখাব। হযরত ওমর রা.-এর শাসনামলে সত্যিই একটি সুন্দর জবাবাদিহিতার নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোন ব্যক্তিই জবাবদিহিতার আওতা মুক্ত থাকতো না। হযরত ওমর রা. তাঁর খেলাফতকালে প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর প্রতি নির্দেশ জারী ছিল, যেন হজ্জের সময় সকলেই মক্কায় উপস্থিত থাকেন। হজ্জ উপলক্ষেও রাষ্ট্রের প্রত্যেক অঞ্চল থেকে অসংখ্য লোক মক্কায় সমবেত হতো। হযরত ওমর রা. সমবেত জনতার সম্মুখে দাঁড়ায়ে ঘোষণা করতেন, কোন কর্মচারীর বির"দ্ধে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে বলতে পারেন। এতে উপস্থিত লোকেরা সামান্য অভিযোগ পর্যন্ড় তাঁর নিকট পেশ করতে পারতো।

একদা প্রকাশ্য সমাবেশে এক ব্যক্তি হযরত ওমর রা.-এর নিকট নালিশ করল, আপনার এক কর্মচারী অযথা আমাকে একশত বেত্রাঘাত করেছে। তখন হযরত ওমর রা. তাকে বললেন, এই সভায় তুমি উক্ত কর্মচারীকে একশত বেত্রাঘাত করে প্রতিশোধ গ্রহণ কর। এরূপ কঠোর নির্দেশ শুনে হযরত আমর ইবন আস দাঁড়ায়ে বললেন, এ রকম ব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসন্ড়োষ দেখা দিতে পারে। জবাবে হযরত ওমর রা. বলেছিলেন, তাই বলে আমি দোষী ব্যক্তির শাস্ড়ির বিধান হতে বিরত থাকতে পারি না। অতঃপর হযরত আমর ইবন আস অভিযোগকারীকে অনুরোধ করে প্রত্যেকটি বেত্রাঘাতের পরিবর্তে দুইটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করেন। (আল ফার"ক, পৃঃ ১৭৫ ইফাঃ ইসলামী বিধিবদ্ধ আইন, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ৪১৬।

দেখুন! এই হলো ইসলামী রাষ্টশাসন ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতার নমুনা। কোন সংগঠন তথা রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে দুর্নীতি রোধ করতে হলে জনগণকে দুর্নীতির বির"দ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদের কার্যকর বিধান এবং বিধান কার্যকরীকরণে কাঠামো তৈরি করতে হবে যেমনটি হযরত ওমর রা. করেছিলেন।

৩. শেষ বিচারের দিন আল-াহপাকের নিকট জবাবদিহিতা ঃ প্রতিটি মানুষকে এই পৃথিবীর জীবনে কৃত সকল কর্মের হিসাব দিতে হবে মহান আল-াহর দরবারে। জবাবদিহিতার এহেন অনুভূতি সৃষ্টিই হলো ইসলামী শাসন ব্যবস্থা দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য। মহান আল-াহ বলেন ঃ

"আর তোমরা আল-াহকে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত জেনে রাখ, তোমরা সবাই তাঁর সম্মুখে সমবেত হবে।" –সূরা বাকারা ঃ ২০৩

"ঐদিনকে ভয় কর সেদিন তোমরা আল-াহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না।" সূরা বাকারা ঃ ২৮১

'নিশ্চয় (তোমাকে) কান, চক্ষু, ও অ"ঙ্করণ- এগুলোর প্রত্যেকটির জন্য জবাবদিহি করতে হবে।" - বনি ইসরাঈল ঃ ৩৬

অতঃপর যে লোক বিন্দু পরিমাণ নেক আমন করবে সে তা দেখতে পারে, আর যে লোক বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজচ করবে সে তা-ও দেখতে পারবে।" সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮

এই প্রসঙ্গে রাসূলুল-াহ স.-এর নিণোক্ত হাদিসটি খুবই গুর"ত্বপূর্ণ ঃ

"চারটি প্রশ্নের জবাব না দেয়া পর্যন্ড় কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি স্বস্থান হতে এক কদম, এক বিন্দুও অগ্রসর হতে পারবে না। (১) জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো, (২) যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করছো, (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে অর্জন এবং কিভাবে কোথায় ব্যয় করেছো এবং (৪) যে পরিমাণ ইলিম শিখেছো-এর উপর কতটুকু আমল করেছে।" – মুসলিম শরীফ।

বস্তুত এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে একজন মানুষের হায়াত বা জীবন, উপার্জন ও ইল্ম বা জ্ঞান। 'হায়াত' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানব জীবনের সবকিছু এর অ"ড়র্ভুক্ত। উপার্জন ও ইলম অন্য অর্থে-অর্থ ও জ্ঞান-বৃদ্ধি মানব জীবনের চালিকা শক্তি। এ দুই চালিকা শক্তি সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে আল-াহ তা'আলার সমীপে জবাবদিহি করতে হবে। মহান আল-াহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ "তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের নিকট অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" – সুরা নাহল ঃ ৯৩

সেই মহা বিচারের দিন মানুষ তার কৃত-কর্মের তালিকায় নিজের কাজের অনু পরমাণু সন্নিবেশন দেখতে পেয়ে একজন কাফির যে আল-াহকে জীবনে কখনো বিশ্বাস করেনি। তার অবস্থা কিরূপ হবে সে সম্পর্কে আল-াহ পাক মানব জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। আল-াহ বলেন ঃ

"আমলনামা যখন তাদের সামনে রেখে দেয়া হবে। তাতে যা আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে ভীত সন্ড্রস্ত্র দেখবে। তারা বলবে, হায় আফসোস। এ কেমন আমল নামা! এতে যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এতে সবই রয়েছে।" – সুরা আল কাহাফ ঃ ৪৯।

পাপ, দুর্নীতি মুক্ত সুন্দর সমাজ তথা প্রশাসন বির্নিমানের ক্ষেত্র জবাবদিহিতার বিকল্প নেই। একজন মু'মিন মুসলিমের ঈমানের অনিবার্য দাবি হচ্ছে জবাবদিহিতা সম্পর্কে সদা সতর্ক সচেতন থাকা। সে তা প্রতিটি কর্মে, আচার-আচরণ আখিরাতে আল-াহপাকের সম্মুখে জবাবদিহি করতে হবে বিশ্বাস ও জ্ঞান দ্বারা নির্বাহ করে। ফলে তার পক্ষে কোন রূপ পাপ, প্রশাসনিক কর্মকান্ডে দুর্নীতির মতো সদাচরণ করা আদৌ সম্ভব নয়।

পাশ্চাত্য প্রশাসন দর্শনে প্রশাসন যন্ত্রই হলো প্রশাসনিক জবাবদিহিতার একমাত্র অবলম্বন। একারণে প্রশাসন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের সহকর্মী অপর কর্মীদের এড়িয়ে বা ম্যানেজ করে যে কোন ধরনের অসাচরণ বা দুর্নীতি করলে তাতে কোন সমস্যা নেইক জবাবদিহি করতে হয়না। তবে কখনো কোন কারণে বিষয়টি ভিন্নরূপ অবস্থান নিলে সেক্ষেত্রে কিছুটা জবাবদিহি করতে হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে প্রতিহিংসা ছাড়া প্রশাসনের কাউকে কখনো জবাবদিহিতার কাঠ গড়ায় দাড়াতে হয়না আর একারণেই আইনের শাসনের দাবী নিভৃতে ডুকরে ডুকরে নিরবে চোখের জল নিঃসরণ করে মাত্র।

৩। স্বাধীন বিচার বিভাগ (Independence Judiciary)

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচার বিভাগ একটি গুর"ত্বপূর্ণ উপাদান। বলতে কি, স্বাধীন বিচার বিভাগ কোন রাষ্ট্রীয় সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। কোন রাষ্ট্রে সত্যিকারার্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কল্পে যে স্বাধীন বিচার বিভাগ অপরিহার্য তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিণোক্ত শতাবলী পূরণ অত্যাবশ্যক ঃ

রাষ্ট্রের পক্ষ হতে যা করণীয় ঃ

ক. যোগ্য অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, নৈতিক গুণাবলীতে ভূষিত একদল ব্যক্তি বর্গকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দান।

খ. বিচারকদের নির্দিষ্ট মেয়াদ কালের কর্মের নিশ্চয়তা দান এবং পারিপার্শ্বিক অব্স্থার সাথে সংগতিপূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রদান।

গ. আইন ও প্রশাসন বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন হিসেবে দায়িত্ব পালনের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দান।

ঘ. বিচারকদের জীবন, মাল, সম্মান ও সন্ড়নাদির পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান।

ঙ. বিচারকদের বিচারকর্মে কোন রকম হস্ড়ক্ষেপ না করা এবং স্বাধীনভাবে বিচারক কার্যক্রম পরিচালনায় সুযোগ সুবিধা দান।

বিচারকদের পক্ষ হতে যা অনুবর্তনীয় ঃ

ক. বিচারকগণ সর্বদা আল-াহর অধীন, অন্য কারোর অধীন নয় প্রত্যয়ে বিচারকার্য পরিচালনা এবং সর্বদা আল-াহকে ভয় ও স্মরণ পূর্বক বিচারিক দায়িত্ব পালন।

খ. আইন সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান অর্জন ও উহার কথাও অনুশীলন অভ্যাস গড়ে তোলা।

গ. সকল প্রকার Judicial properiety অনুসরণ ও অনুশীলন করা যাতে কেউ ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না হয়। এবং বিচার বিভাগের উপর হতে আস্থা না হারায়।

ঘ. সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকাপালন।

ঙ. বিজ্ঞ বিচারকের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও তা সমুন্নত রাখা।

চ. সমাজ ও রাষ্ট্রের ঘটনাবলী সম্পর্কে অবগত হয়ে, প্রয়োজনে স্বীয় উদ্যোগে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হওয়া।

ছ. সত্যের মানদন্ডে আইনের এবং আইনের প্রেক্ষিত জনগণের এবং শাসন কার্যক্রমে নিয়ত কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা।

স্মাতব্য, কোন রাষ্ট্রে আইনের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যদি বিচার বিভাগ স্বাধীন ভাবে ভূমিকা শাসন না করতে পারে, না করে, তাহলে সে রাষ্ট্রে আইনের ও শাসনের যুলুম প্রতিষ্ঠিত হয়। জনগণের জীবনে নেমে আসে সীমাহীন অত্যাচার যুলুম ও নির্যাতন।

৫। আইনের শাসনে নৈতিকতার ভিত্তি ও গুর"ত্ব

Basis and Insportance opf morality in the rule of law

সত্যের বিধান অবলম্বনের প্রেক্ষিতে মনে সত্য মিথ্যার সৃষ্ট চেতনাকে নৈতিকতা বলে। নৈতিকতা একটি আলো যা অন্ধকারে সঠিক কর্মের শিক্ষা দেয়। পন্ডিতগণ একে সত্যের বিনিময় মূল্য ও বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। মানুষের জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতাকে সত্যের সাথে সম্পৃক্ত করে এমন মূল্য বোধ সৃষ্টি করা যাতে জীবনটাই সত্যের অনুরাগী এবং মিথ্যার বিরাগী হিসেবে গড়ে উঠে।

বৈজ্ঞানিক থ্রিং এর মতে মানুষের সকল কাজের তথা অবদানের মূলে 3H (Head+Heard+Hand) এর ভূমিকা থাকে সমধিক। মানুষ মাথা দিয়ে চিন্ড়া করে, , হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এবং হাত দিয়ে কাজ করে। সত্যের ধারণা তথা জ্ঞান চিন্ড়ার জগতে প্রবেশ করে স্থায়ী আসন গেড়ে নেয়ার পর যখন উক্ত সত্যের দাবী হৃদয় দ্বারা উপলব্ধির পর বিশ্বাসে রূপলাভ করে তখন তা হাতের মাধ্যমে বাস্ড়বতায় রূপান্ড়রিত হয়। মূলতঃ তখনই একজন মানুষ সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ ঠিক এভাবে সৃষ্টি হয়। মানুষের চিন্ড়ার জগতে যখন সত্য অনুপ্রবেশ করে তখন সে তা গ্রহণ করে এবং ইহার আবেদন হৃদয় দ্বারা অনুভব করে এই অনুভবই তাকে সত্য নির্দেশক কাজে প্রেষিত করে। মানুষ তখন ভাল কাজ করতে প্রবৃত্ত হয় এবং মন্দ কাজ পরিহার করে চলে। এটি যখন একজন ব্যক্তির জীবনে মূল্যবোধ হিসেবে গৃহীত হয়, তখনই সে নৈতিক মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা লাভ করে। তখন এই ব্যক্তির চিন্ড়ার আদর্শ হয় তথ্য এবং অনুভূতির নিবেদন হয় কল্যান, এবং কর্মের বৈশিষ্ট্য হয় সুন্দর।

যে জাতির মানুষের মনে সত্যের স্বরূপ যেরূপ প্রতিফলিত হয়, সে জাতির নৈতিক মূল্য বোধের সৌধ সেরূপ নির্মিত হয়। বর্তমান বিশ্বে সত্যের জ্ঞান দু'টি উৎস হতে নির্গত হয়। একটি ওহি ভিত্তিক উৎস এবং অপরটি মানব সৃষ্ট। বলতে কি, ওহির প্রকৃত সত্যই একমাত্র সত্য অপরটি মিথ্যা জগাখিচুড়ী প্রকৃতির যার কোন বৈশিষ্ট্যই নেই। এখন দেখা এই দুটি উৎস হতে প্রাপ্ত সত্যের বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ কিরূপ মানুষের ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখে থাকে।

প্রথমতঃ ওহি ভিত্তিক সত্যের বিধানের ভিত্তি ঃ এ উৎসের প্রধান প্রতিপাদ্য হলো আল-াহ একমাত্র সত্য, কুরআন হলো এ সত্যের একমাত্র মানদন্ড ও বিধান এবং রসুল স. হলেন এ সত্যের একমাত্র মডেল। মানুষের ব্যক্তিক, সামষ্টিক এবং বৈশ্বিক জীবনে এ সত্যের বিধান এরূপ কল্যাণ ও সুন্দর প্রতিষ্ঠার মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, যা বাস্ড়ব, ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ও সংহতিপূর্ণ এক মহা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ যা সকল মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে একস্থায়ী বিশ্বশান্ড়িপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম।

একমাত্র সত্যের বিধানের মৌলিক প্রত্যয়াবলী ঃ এ সত্য তথা ইসলামের এমন কতিপয় মৌলিক বিষয় রয়েছে যার সাথে 3H-এর সমন্বয় সাধনপূর্বক সেরূপ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে জীবন গঠন ও পরিচালনার মধ্যেই প্রত্যাশিত নৈতিকতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন সম্ভব। এ সত্যের মৌলিক বিষয়গুলো হলো ঃ

১। আল-াহ
২। ফেরেশতা
৩। রসূলুল-াহ স.
৪। কিতাব
৫। পরোকাল ও বা আখেরাত।

উপরোক্ত বিষয়াবলী আলোচনার প্রাক্কালে ঈমান ও আমল সম্পর্কে একটু আলোচনা করা সমীচীন।

ঈমান ঃ কুরআনে ঈমান বলতে চরিত্রের মানসিক ভিত্তিকে বুঝানো হয়েছে। "ঈমান" শব্দটি মূলতঃ 'আমল' ধাতু থেকে নির্গত যার অর্থ আত্মার প্রশান্ড়ি ও নির্ভীকতা। বলতে কি, এ থেকেই গঠিত হয়েছে আমানত। আমানত খেয়ানতের বিপরীত। এখানে ঈমানের তাৎপর্য হলো মনের মধ্যে কোন কথা তথা বিষয়ের গভীর প্রত্যয় ও সত্যতার সাথে এমনভাবে দৃঢ়মূল করে নেয়া, যাতে ইহার প্রতিকুল বা বিপরীত কিছুর স্থান পাওয়া ও প্রবিষ্ট হবার কোন শংকাই না থাকে।

আমল ঃ আমল অর্থ যে বিষয়ে ঈমান আনা হয়, যে বিষয়ের নির্দেশ বা নির্দেশনা অনুযায়ী আচরণ গঠন ও পরিচালনা। অর্থাৎ ঈমানের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করা। এদ্বারা 3H-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার সম্ভব।

ঈমান ও আমল বলতে উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় অবলম্বন এবং সে অনুযায়ী আচরণ করাকে বুঝায়। বিষয় পাঁচটি সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হ'লঃ

১. আল-াহ ঃ আল-াহর আনুগত্য ও প্রতিনিধিত্ব করা অর্থাৎ মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যবস্থাপনার প্রথম ও মৌলিক বিষয় হলো আল-াহর প্রতি ঈমান। আল-াহর আনুগত্যের ব্যবস্থাপনার যত দিক ও বিভাগ বিদ্যমান ইহা সবই এই মূল কান্ড আবর্তিত এবং এইসব শাখা-প্রশাখা মাত্র। আল-াহকে বাদ দিয়ে ইহার কোন গুর"ত্ব নেই। এটি খুবই বিস্তৃত। এটি মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যানুগ সকল কর্মকান্ডের আদর্শিক, ব্যবহারিক মূল্যবোধ সৃষ্টি শক্তির উৎস।

আল-াহর প্রতি ঈমানের সংক্ষিপ্ত রূপ হলো-কলেমা লা-ইলাহা ইল-ালাহ' অর্থাৎ আল-াহ ছাড়া কোন প্রভু নেই-কথাগুলো মুখে স্বীকার করে অন্ড়র দিয়ে বিশ্বাস করা।

আল-াহ ছাড়া কোন প্রভু (ইলাহ) নেই প্রত্যয়ের সাথে মানুষের সকল আবেগ-অনুভূতি, ধ্যান-ধারণা, চিন্ড়া- কল্পনা, মত-বিশ্বাস ও আনুগত্যকে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত করে দেয়াই আল-াহর প্রতি ঈমান।

কলেমা লা-ইলাহ-ইল-াল-াহ এর মূল উপাদান মূলত তিনটি ঃ

(এক) প্রভু সম্পর্কিত ধারণা

(দুই) সমস্ড় বস্তু নিচয়ের প্রতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন

(তিন) প্রভূত্ব কেবলমাত্র আল-াহর জন্যই স্বীকৃতিদান।

বলতে কি, কুরআনে আল-াহ তা'আলার যে সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে তা মূলত এ তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা মাত্র।

(এক) ইলাহ বা প্রভু সম্পর্কিত ধারণা ঃ একমাত্র আল-াহ-ই ইলাহ। তথা সত্য। এমন সত্তাই কেবল ইলাহ বা প্রভু বা সত্য হতে পারেন, যিনি বে-নিয়াজ, অন্য নিরপেক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও চিরঞ্জীব, যিনি চিরকাল ধরে আছেন এবং চিরদিন ধরে থাকবেন, যিনি একচ্ছত্র শাসক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান, যার শক্তি সবার উপর বিজয়ী, যার হিমমত ও বুদ্ধিমত্তায় কোন ত্র"টি বিচ্যুতি নেই, যার আদল ও ইনছাফে জুলুমের চিহ্ন পর্যন্ড় নেই, যিনি জীবন দাতা এবং জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উকরণাদি সরবরাহকারী। যিনি ভাল-মন্দ এবং লাভ-ক্ষতির যাবতীয় শক্তির অধিকারী। যার অনুগ্রহ ও হেফাজতের সবাই মুখাপেক্ষী, যার দিকেই সকল সৃষ্টি বস্তু প্রত্যাবর্তনশীল। যিনি সবার হিসাব গ্রহণকারী, শাস্ড়ি ও পুরস্কার দানের একমাত্র মালিক।

(দুই) সমস্ড় বস্তু নিচয়ের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ঃ এসব গুণাবলী অভিভাজ্য, অহস্ড়ান্ড়রযোগ্য চিরস্থায়ী। একমাত্র আল-াহ ছাড়া আর কেউ এহেন গুণাবলীর অধিকারী হতে পারেন না। কেউ যদি তা দাবী করে তবে সে দাবী অবাস্ড়ব, অবাস্ড়ব ও পাগলামী ব্যতিত কিছুই নয়। সুতরাং ইলাহ বা সত্য হিসেবে আল-াহর এসবগুণাবলী আর কারোর না থাকায়, কেউ তা দাবী করলে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তাতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। পৃথিবীর কারোর প্রতি এহেন যে কোন একটা বা সকল গুণাবলী আরোপ অসম্ভব। কেননা বিশ্বের সকল বস্তুই সৃষ্টি, অন্য নির্ভরশীল, পরাধীন এবং ধ্বংস ও বিনাশশীল। তাই তারা মানুষের কোন আনুগত্য পাবার অধিকারী নয়।

(তিন) প্রভুত্ব কেবল আল-াহর জন্যই স্বীকৃত ঃ বস্তুত এ কারণেই একটি সত্তার জন্যই মানুষের তথা সকল সৃষ্টির আনুগত্য পাওনা। আর সে সত্তা হচ্ছেন মহান আল-াহ। অন্য কোন সত্তা মানুষের আনুগত্য দাবী করতে পারে না এবং মানুষও একমাত্র আল-াহকে ছাড়া কাউকে আনুগত্য করতে পারে না।

উলে-খ্য, আল-াহর আনুগত্যের বাইরে অন্য কোন সত্তার আনুগত্যই। সবৈব মিথ্যার আনুগত্য অন্য যে সব সত্তা সত্য হিসেবে মানুষের আনুগত্য দাবী করে থাকে তারা হলো ঃ শয়তান, মানুষের নফসে আম্মারা, তাগুত অর্থাৎ অন্য কোন মানবীয় শক্তি হতে পারে বা রাষ্ট্র বা সমাজ বা পরিবার।

২। ফেরেশতা ঃ ফেরেশতা হচ্ছে আল-াহর এই বিশাল সাম্রাজ্যের কর্মচারী। আল-াহপাক তাদের উপর এই বিশ্ব ব্যবস্থাপনার যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তারা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনে নিরত। তারা কখনো আল-াহর আদেশ লংঘন করে না। তাদের কাজ কেবল আল-াহর বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করা। ফেরেশতাদের সংখ্যা কত তা একমাত্র আল-াহ পাকই জানেন। মানুষের এই পৃথিবীতে আল-াহর আনুগত্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে অসংখ্যক ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে। তারা মানুষের সকল কাজের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে, যা এই পৃথিবীর জীবন শেষে পরকালীন জীবনে আনুগত্যের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার কাজে ব্যবহৃত হবে।

৩. রাসূল ঃ আভিধানিক অর্থে রসুল বলতে এমন ব্যক্তিকে বুঝায় যিনি একজনের বাণী অন্যের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। ইসলামী পরিভাষায় আল-াহর বাণী তথা সত্যের বিধান তার বান্দার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব যে সকল ব্যক্তিদের উপর অর্পিত হয়েছে তাদেরকে বলা হয় রসূল বা নবী। শাব্দিক অর্থে রাসূলকে পথ প্রদর্শক বলা হয়। এই পৃথিবীতে মানব-জাতির ইতিহাসে হযরত আদম আ. প্রথম মানুষ হিসেবে প্রথন নবী রাসূল ছিলেন। অতঃপর কাল পরিক্রমায় অসংখ্যক নবী বা রাসূল এসেছেন এ দায়িত্ব পালনে। হযরত মুহাম্মদ স. হচ্ছেন সর্বশেষ রাসূল। এই পৃথিবীর শেষ দিবস পর্যন্ড় আর কোন নবী বা রাসূল আল-াহর আনুগত্যের বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আসবেন না। কেননা আল-াহ তাঁর হেদায়াতের তথা সত্যের বাণী ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

৪. কিতাব ঃ ইসলামে কিতাব বলতে এমন গ্রন্থকে বুঝায় যা মানুষের কিসে আল-াহর আনুগত্য, কিসে আনুগত্য নয়, তা নির্দেশের জন্য আল-াহর তরফ হতে রাসূল এর প্রতি অবতরণ করা হয়। ইসলামী পরিভাষায় একে খোদায়ী কালাম বা সত্যের বিধান বলা হয়। একে মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে, ব্যাখ্যা, বিশে-ষণ করা এবং বাস্ড়বে রূপায়িত করার জন্য রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

কিতাব হলো আল-াহর আনুগত্যের শিক্ষামূলক বর্ণনা আর তার বাস্ড়ব নমুনা হলো রাসূলের জীবন। কুরআন হলো সর্বশেষ আল-াহর কালাম বা সত্যের বিধান। আগে অনেক কিতাব আল-াহ্ পাক সংশি-ষ্ট নবী/রাসূলদের উপর অবতীর্ণ করেছেন। যেগুলোর কোনটিই প্রকৃত অবস্থায় নেই। তবে সে সব কিতাবের প্রতি ঈমান থাকতে হবে।

এই কুরআন বর্তমান বিশ্ব মানব সম্প্রদায়কে কিসে ন্যায় এবং কিসে অন্যায় বা কোনটি সত্য এবং কোনটি মিথ্যা তা সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছে। কুরআনের নির্দেশের পরিপন্থী সকল বিষয় অসত্য যা যুলুম। কুরআন মানুষের জীবন বিধান এবং হযরত মুহাম্মদ স. জীবনাচরন। কুরআন মানেই রসূলুল-াহ স.-এর জীবন আলেখ্য।

৫. পরকাল বা আখেরাত ঃ পরকাল বা আখেরাত বলতে মানুষের এই পৃথিবীর জীবন শেষে এই পৃথিবীতে আল-াহর আনুগত্য ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পরীক্ষার ফলাফল প্রদান এবং তদনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্ড়ির বিধান কার্যকরী করার কালকে বুঝায়। পরকালীন জীবন অনন্ড়কাল। এই পৃথিবীতে যারা স্বেচ্ছায় আল-াহর আনুগত্য করবে তারা পুরস্কার স্বরূপ চির শান্ড়ির স্থান বেহেশতে যাবে এবং যারা স্বেচ্ছায় আনুগত্য করবে না তারা চির শাস্ড়ির স্থান দোযখে যাবে।

উৎস ঃ ড. মোঃ আনছার আলী খান, দুর্নীতি নিরসনে ইসলাম পৃষ্ঠা ২১-২৪।

ওহি ভিত্তিক সত্যের বিধানের উপরোক্ত ভিত্তির প্রেক্ষিতে প্রণীত বিধান এবং তা অনুবর্তনে যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃস্টি হয় তা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অভাবনীয় ও অতুলনীয় অবদান রেখে থাকে। বিষয়টি খুবই
বিস্ড়ত তবে এ পরিসরে আমরা নিম্নোক্ত শিরোনামে তা সংক্ষেপে আলোচনা করব ঃ

এক. সত্যের বিধানের বৈশিষ্ট্য

দুই. সত্যের বিধানের কতিপয় নৈতিক নির্দেশনা

তিন. সত্যের বিধান অনুবর্তনে মানবিক বৈশিষ্ট্য

এক. সত্যের বিধানের বৈশিষ্ট্যাবলী ঃ একমাত্র সত্য আল-াহর কাছ থেকে প্রাপ্ত সত্যের বিধানের নাম শরিয়ত। শরিয়ত হলো সেইসব আদেশ-নিষেধ ও পথ নির্দেশ যা মহা সত্য আল-াহতা'আলা তার বান্দার প্রতি জারী করেছেন। ইহার উলে- খযোগ্য বৈশিষ্ট্যাবলী হলো ঃ

১. এটি চিরস্থায়ী, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে একমাত্র সহজ ও সরল পথ।

২. এটি সর্বজনীন, বিশ্বের সর্বকালের, সর্ব পর্যায়ের সকল মানুষের একমাত্র কল্যাণ বিধান, এতে কোন সাংঘার্ষিক বিধান নেই, নেই কোন অসামঞ্জস্যতা।

৩. ইহা মানুষের মৌলিক স্বার্থ বা অধিকারের- দ্বীন, প্রাণ, বংশ, ধন-মাল, বিবেক-বুদ্ধি ও স্বাধীনতা কার্যকর গ্রান্টি প্রদান করেছে।

৪. এটি একদিকে স্থায়ী বিধান এবং অপরদিকে পরিবর্তনশীল বিধানের সমন্বয়ে গঠিত। স্থায়ী বিধান পরিবর্তনের কোন এখতিয়ার কারোর নেই। তবে পরিবর্তনশীল ক্ষেত্রে স্থায়ী বিধানের মানদন্ডে মুসলিম পন্ডিতগণ বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন পূর্বক প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নের অবকাশ স্বীকৃত।

৫. এটি বাস্ড়ব ধর্মী বিধান, পে-টোর রিপাবলিকের মত কল্পনাবিলাসী নয়। রসুলুল-াহ স. তাঁর ২৩ বছর নবুওয়তী জীবনে ইহা বাস্ড়বায়ন করে দেখিয়ে গেছেন।

৬. এটির উদ্দেশ্য একমাত্র মানব কুলের কল্যাণ। এজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কষ্টকে লাঘব বা মৌকুফ করা হয়েছে এবং ইহা লংঘনের অপরাধকে তওবার মাধ্যমে মাফ করে দেয়ার সুযোগও দেয়া হয়েছে।

৭. এ বিধান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এমন প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যাখ্যা প্রবর্তন করেছে, যাতে প্রত্যেক অনুসারীর পক্ষে তা সহজে জানা ও বুঝার অবকাশ সৃষ্টি হয়। এছাড়া এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের conteant এ এমন সব বিষয় অন্ড়র্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে ইহার অনুসারী প্রত্যক্ষ ভাবে মহা সত্য আল-াহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এই সম্পর্কে একজন অনুসারীকে সত্যবাদী ও সত্যপন্থ হতে অত্যন্ড় সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখে। পৃথিবীর কোন বিধানে এমনটি নেই এবং থাকাও সম্ভব নয়?

দুই. সত্যের বিধানের কতিপয় নৈতিক বিধানের নমুনা ঃ

মহা সত্য আল-াহ, তাঁর সত্যের বিধান ইসলামে সত্যের তথা সত্যের বিধান এত বিস্ড়তভাবে বিধৃত করেছেন যে, তা সংক্ষেপে লিখে বা বলে শেষ করা সম্ভব নয়। মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ড় এই পৃথিবীর জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিধান এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিধানাবলীও এতে সুবিস্ড়রিত বিধৃত হয়েছে।

মহানবী স.-এর গোটা জীবনটাই সত্যের বিধান বা নৈতিকতার নির্দেশনায় ভরপুর। মহান আল-াহ বলেন ঃ

"আমি আপনাকে গোটা বিশ্ব জগতের জন্য রহমত বা করুণা স্বরূপ প্রেরণ করেছি।"-আল কুরআন।

আল-াহর নবী স. নিজেই বলেছেন ঃ "উন্নত চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।"

মহা নবীর এ মহান নৈতিক শিক্ষাবলী নৈতিকতা বিবর্জিত আরব তথা গোটা বিশ্বকে দান করেছিল নৈতিকতার এক সুবিশাল ভান্ডার। আল-াহকে ভয় করার গুণে গুণান্বিত এবং এসব নৈতিকতার শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে আরবের মরুচারী বেদুঈনরা মাত্র পঞ্চাশ বছরে বিশ্বের সেরা নৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই নৈতিক শিক্ষার বর্ণনা পবিত্র কুরআন ও হাদিসে পাওয়া যায়। আবসিনিয়র রাজদরবারে হযরত জাফর তাইয়ারের ভাষণে এর কিছুটা বিবরণী পাওয়া যায়। এর উপর বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে সীরাতে রাসূল স. রিয়াদুস সালিহীন উলে- খযোগ্য ও সহজ প্রাপ্ত।

নিম্নে কতিপয় সত্যের বিধানের নির্দেশনা বিধৃত হলো ঃ

১. হে মানব মন্ডলী, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, আর এ উভয় থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য নারী-পুরুষ।" সূরা আল-নিসা ঃ ১

২. "হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদেরকে এক নর-নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন দল-গোত্রে, যাতে করে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার।"-সূরা আল হুজরাত ঃ ১৩।

৩. আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করলে তুমি তাদেরকে নিশ্চয়তা দাও যে, আমি অতি নিকটবর্তী। আহবানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার দোয়া শুনি। সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মেনে চলা। এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা কল্যাণের পথ লাভ করতে পারে।" সূরা বাকারা! ১৮৬।

৪. আল-াহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেনা না।"- সূরা বাকারা ঃ ২৮৬

৫. "দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি।" - সূরা আল হজ্জ ঃ ৭৮।

৬. "তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে আল-াহ ভীতিতে অগ্রবর্তী" - আল কুরআন।

সত্যের বিধান ইসলাম, মহা সত্য আল-াহর আদেশ ও নিষেধের সমষ্টি, যা অনুবর্তনে এমন সমাজ গঠিত হয় যেখানে নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। নিম্নে উলে- খযোগ্য নৈতিকতার কিছু আদেশ ও নিষেধ বিধৃত হলোঃ

আদেশ	নিষেধ
১. সত্যবাদী হওয়া	১. মিথ্যা পরিত্যাগ
২. ক্ষমাশীলতা	২. কার্পন্য না করা
৩. আল-াহর উপর নির্ভরশীলতা	৩. অপব্যায় না করা
৪. ধৈর্যশীলতা	৪. অহংকার না করা
৫. কৃতজ্ঞতা	৫. আমানতের খেয়ানত না করা
৬. সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকা	৬. অসৎ কাজে নিষেধ করা
৭. আল-াহর পথে জীবন দান	৭. কারো নিন্দা না করা

৮. দানশীলতা	৮. কাউকে উপহাস না করা
৯. মধ্যম পন্থা অবলম্বন	৯. সাক্ষ্য গোপন না করা
১০. আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণ করা।	১০. কর্কষ ভাষী না হওয়া
১১. দরিদ্রকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করা	১১. ভূ-পৃষ্ঠে উদ্যতভাবে না চলা
১২. দাস-দাসী ও কয়েদীদের প্রতি সদয় আচরণ	১২. হারাম বর্জন।
১৩. আমানতদারী হওয়া	১৩. ভিক্ষাবৃত্তি না করা।
১৪. প্রতিশ্র“তি রক্ষা করা	১৪. আত্মহত্যা, সন্ড়ান হত্যা না করা।
১৫. অঙ্গীকার রক্ষা করা	১৫. মাপে ও ওজনে কম না দেয়া।
১৬. সৎ কাজের আদেশ করা	১৬. অরাজকতা সৃষ্টি না করা।
১৭. পারস্পরিক সম্প্রীতি রক্ষা	১৭. সকল অশ-ীলতা থেকে বিরত থাকা।
১৮. পিতা-মাতার অনুগত ও সেবাযত্ন করা	১৮. ব্যভিচার না করা।
১৯. একে অপরকে সালাম দেয়া	১৯. কারোর ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করা।
২০. সর্বদা হক কথা বলা	২০. বিশ্বাস ভঙ্গ না করা।
২১. ন্যায়পরায়নতা	২১. বেহুদা কার্যকলাপ থেকে রিবত থাকা।
২২. সত্যের সাক্ষ্যদান	২২. ক্রোধ না করা।
২৩. নম্রভাষী হওয়া	২৩. বিতর্ককালে শিষ্টতা বজায় রাখা।
২৪. আপোষকামিতা	২৪. অন্যদের দেবদেবীর নিন্দা না করা।
২৫. লোকদের মাঝে সখ্যতা প্রতিষ্ঠা	২৫. দানের পর কাউকে খোঁটা না দেয়া।
২৬. মানবতার ভিত্তিতে ভ্রাতৃত্ব	২৬. উপহাস বা ঠাট্টা না করা।
২৭. হালাল ভক্ষণ	২৭. চুরি-ডাকাতি, হাইজ্যাক ও পরধন আত্মসাৎ না করা।
২৮. স্বহস্তে উপার্জন	২৮. নিজেকে পূন্যবান বলে জাহির না করা।
২৯. ব্যবসা বাণিজ্য করা	২৯. অন্যায় কসম খাওয়া নিষেধ।
৩০. জনগণকে উত্তম শিক্ষা দান	৩০. মিথ্যা অপবাদ দেয়া হারাম।
৩১. এতিমদেরকে অভিভাবক হিসেবে দেখাশুনা করা	৩১. সাহায্য প্রার্থীকে ধমক না দেয়া।
৩২. চক্ষু সংযত রাখা	৩২. এতিমকে শোষণ না করা।
৩৩. সতর ঢাকা ও পর্দা মেনে চলা	৩৩. আল-াহর নেয়ামত গোপন না করা।
৩৪. চোখ-কান ও অন্ড়রকে হেফাযত, কেননা এ সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।	৩৪. পরনিন্দা না করা।
৩৫. নিঃস্বার্থ থাকা	৩৫. কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ না করা।
৩৬. শত্র“র প্রতি বদান্যতা	৩৬. প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বিরত থাকা।
৩৭. বিচারকালে ন্যায় বিচার করা	৩৭. সুদ ও ঘুষ না খাওয়া।
৩৮. শত্র“র সাথেও ইনসাফপূর্ণ আচরণ।	৩৮. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করা।
৩৯. অন্ড়রে আল-াহর ভয় পোষণ ও শূচীতা।	৩৯. জুয়া না খেলা।
৪০. মজলিসে সদাচরণ	৪০. মদ পান না করা।
৪১. দুঃস্থ, দুর্বল ও মহিলাদের প্রতি সদাচরণ।	৪১. ধন-সম্পদের মোহে আবিষ্ট না হওয়া।
৪২. স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পারিক হক আদায়।	৪২. অত্যাচার, অবিচার থেকে বিরত থাকা।
৪৩. দেহ, প্রাণ ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা রক্ষা	৪৩. কারোর সাথে লজ্জাহীন আচরণ না করা।
৪৪. আল-াহর নেয়ামতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।	৪৪. অন্যের বিপদে উল-সিত না হওয়া।
৪৫. সকলের প্রতি সদয় থাকা।	৪৫. বংশ গরিমা পরিহার করা।
৪৬. ধার পরিশোধ করা।	৪৬. ভিক্ষা বৃত্তি না করা।
৪৭. দেনাদারকে মাফ করে দেয়া।	৪৭. অন্যের বির“দ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি থেকে বিরত থাকা।
৪৮. কর্মে অবিচলতা।	৪৮. কাউকে গালি না দেয়া।
৪৯. ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান।	৪৯. স্বজনপ্রীতি ও গোড়ামী থেকে বিরত থাকা।
৫০. স্বার্থহীনভাবে সৎ কর্ম করা।	৫০. মাতম থেকে বিরত থাকা।
৫১. পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা।	৫১. দ্বিমুখী নীতি থেকে বিরত থাকা।
৫২. একে অপরকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে তাগিদ দেয়া।	৫২. আল-াহকে ভুলে না থাকা।
৫৩. আদান প্রদান বা মোআমালাতে সততা ও বিশ্বস্থতা অবলম্বন।	৫৩. সত্যের বিধান কুরআন শরীফ ভুলে না যাওয়া ইত্যাদি।
৫৪. জীবে দয়া করা	

৫৫. অন্ধকে সহায়তা করা। ৫৬. র“গ্ন ব্যক্তিকে সেবা শুশ্র“ষা করা। ৫৭. ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি।	

ইসলামের বিধানের এ তালিকা দেখে নবী করীম স. এর নৈতিকতার শিক্ষাবলীর ব্যাপকতা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করা যায়। একবার জনৈক বিধর্মী সাহাবী হযরত সালমান ফারসীকে উপহাসছলে বলেছিল যে, তোমাদের নবী সাধারণ ব্যাপারেও কথা বলেন্ এতে সালমান ফারসী গর্ব করে বলেছিলেন ঃ

"হ্যাঁ, আমাদের নবী স. আমাদের পিতৃসম। তিনি আমাদেরকে সকল শিক্ষাই দিয়ে থাকেন। এমন কি শৌচ কর্ম কিভাবে করতে হবে তাও তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।"

বস্তুতঃ এ থেকে ইসলামের নৈতিকতার বিধান সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়।

তিন. সত্যের বিধান অনুবর্তনে মানবিক বৈশিষ্ট্য ঃ

সত্যের বিধান ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে অনুবর্তনে অতুলনীয় দৃষ্টান্ড় স্থাপন করেছে। এর মূলে আল-াহর ভয় ও পরকালে মানুষের সকল কাজের কঠিন জবাবদিহিতা চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এ সম্পর্কে আমরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বপ্রাপ্ত জনশক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং জবাবদিহিতা পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি।

নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ড় উপস্থাপন করা হলো ঃ

● সাধারন একজন মুসলিম সৈনিক পারস্য সম্রাটের রাজমুকুট এবং তার মহা মূল্যবান হীরা জহরত মানি-মানিক্য রাতের আঁধারে গোপনে আত্মসাৎ না করে সেনাপতির হাতে এনে তুলে দিয়েছে।

● একান্ড় গোপন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে অবৈধ গর্ভধারিনী আল-াহর ভয়ে তওবার জন্য পাগলপারা হয়ে মহানবীর দরবারে বার বার উপস্থিত হয়ে স্বেচ্ছায় প্রস্ড়রাঘাতে মৃত্যুর কঠিনতম শাস্ড়ি মাথা পেতে নিয়েছে। তবুও পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে রাযী হয়নি।

● হাজেরা মাউত হতে ছয়েনা পর্যন্ড় প্রকাশ্য দিবালোকে কোন ষোড়শী তর“ণী একা একা ভ্রমণ করলেও তার দিকে কেউ চেয়েও দেখেনি।

● রাতের অন্ধকারে আল-াহর ভয়ে মায়ের আদেশের পরও তর“ণী দুধে পানি মিশ্রিত করেনি।

● আইনসঙ্গত কষাঘাত অপরাধীর খালি শরীরে প্রদান করাকে অপমানকর বিবেচিত হয়েছে।

বস্তুত সত্যের বিধান ইসলাম মানুষের এমন নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে সেখানে আইন ভেঙ্গে নয়, বরং তা অনুবর্তন ও বাস্ড়বায়নে পারস্পরিক সহযোগী ও প্রতিযোগী চলে। পৃথিবীর কোন বিধানে এমনটি নেই এবং থাকা সম্ভবও নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ মানবসৃষ্ট সত্যের বিধান ঃ আমরা আগেই বলেছি মানুষ কখনো সত্যের বিধান রচনা করতে পারেনা। এটি তার সাধ্যের বাইরে। তবে যেহেতু মানুষকে কোন না কোন বিধান অনুবর্তন করে চলতে হয়, সে যত বড় মিথা বা যুলুম পূর্ণ হোক না কেন, সেহেতু মানুষ তার প্রয়োজন পূরণের জন্য একটা একটা বিধান প্রণয়ন করে থাকে।

সহজ কথায় মানুষ প্রকৃত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে যে বিধান রচনা করে তার ভিত্তি প্রধানতঃ চারটি ঃ

১। ইচ্ছা শক্তি (will force)
২। বুদ্ধি (Intelligence)
৩। বিজ্ঞান (Science)
৪। ইতিহাস (History)

এখান দেখা যাক এ চারটি ভিত্তির উপর নির্ভর করে মানুষ তার জন্য কেমন বিধান প্রণয়ন করে থাকে।

১। ইচ্ছাশক্তি (willforce) ঃ মানুষ তার সকল কাজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই করে থাকে। মানুষের সকল প্রেরণার উৎস এই ইচ্ছা শক্তি। মানুষ তার সত্যের বিধান অর্থাৎ যার ভিত্তিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে তা এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিগত কারণে এমন সব দুর্বলতা রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে সে উহা প্রণয়নে সফল হয় না। মানুষকে অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে দেয়া যাবতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পরেও যদি কোন অতীব গুর“ত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করতে দেয়া হয়, তখন সে প্রায় শতকরা নিরানব্বইটি মারাত্মক ভুল করে বসে। সত্যের বিধান কখনো মিথ্যার প্রেক্ষিতে প্রণীত হতে পারে না। এখন প্রশ্ন ঃ এই ইচ্ছাশক্তি ক'জনের, একজনের না বিশেষ কোন শ্রেণীর না র“শোর মত সার্বজনীন (General will)। এ প্রশ্নের জবাব এবং বাস্ড়বতা নিয়ে আজও মতদ্বৈততা রয়েছে। মানুষের জীবনের প্রকৃত চাহিদা, প্রকৃত সমস্যা নির“পন এই ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিরূপন সম্ভব নয়। কেননা অনেক ক্ষেত্রে একজন মানুষ নিজেই জানে না তার প্রকৃত সমস্যা কি এবং কি সে সমস্যার প্রকৃত সমাধান। মানুষ তার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কোন সমস্যার সমাধান দিলে, সে সমাধান হাজারও সমস্যার সূত্রপাত ঘটিয়ে থাকে। মানুষের ইচ্ছা শক্তি অনুশীলনের দ্বারা জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অসামঞ্জস্যতা সৃষ্টি করে। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি বলে মানুষ তার জীবনের সত্যের বিধান রচনা করতে আদৌ সক্ষম হয় না।

২। বুদ্ধি (Intelligence) ঃ মানুষের বুদ্ধির ক্ষমতা অসাধারন, এবং অভ্যন্ড়রিন তীব্র প্রেরণা শক্তি। কিন্তু সত্যের বিধান প্রণয়নে কার বুদ্ধি ব্যবহৃত হবে। বুদ্ধি অনুযায়ী কোন সিদ্ধান্ড় গ্রহণের ক্ষেত্রে যে তথ্য প্রয়োজন তা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় কর্তৃক সংগৃহীত হওয়ায় পক্ষপাতদুষ্ট মুক্ত হয় না। এছাড়া মানুষের ইচ্ছার সীমাবদ্ধতা বুদ্ধির সাথে যুক্ত হয়ে আর একটা এমন সত্তা তৈরী করে যা সহজ-সরল কোন সুষ্ঠু ও বাস্ড়ব সম্মত সিদ্ধান্ড় গ্রহণে অন্ড়রায় সৃষ্টি করে। সুতরাং ইচ্ছা ও বুদ্ধি বলে কোন সত্যের বিধান রচনা করা সম্ভব নয়।

৩। বিজ্ঞান (Science) ঃ বিজ্ঞান বলতে বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা ও পর্যাবেক্ষণ লব্ধ জ্ঞানকে বুঝায়। মানব জীবনে এর প্রভূত অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের জন্য সত্যের বিধান রচনা পূর্বক সে মোতাবেক কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা নির্ণয় করা অসম্ভব। কেননা বিজ্ঞান এখানে প্রকৃত সত্যের কোন কিছুই মানতে নারাজ। যা প্রত্যক্ষ করা যায় না তা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ প্রকৃত সত্যের উৎস সৃষ্টিকর্তাকে কখনই দেখা যায় না। সত্যের বিধান রচনা করতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং মর্যাদা নির্ধারণ। এ কাজটি করতে গিয়ে বিজ্ঞান মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির মতো এক প্রকার সৃষ্টজীব হিসেবে আখ্যায়িত করে। যা প্রকৃত সত্যের মূল spirit তথা উদ্দেশ্য পরিপন্থী। এছাড়া বিজ্ঞান কখনো

কোন বিষয়ে চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড় দিতে পারেনা, সেক্ষেত্রে সত্যের বিধান কিভাবে তা ঘোষণা করবে। আজ যাকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করলো কিন্তু কদিন পর উহার গ্রহণযোগ্যতা নাও থাকতে পারে?

৪। ইতিহাস (Histry) ঃ মানুষের জ্ঞান অর্জনের সর্বশেষ উপায় হলো ইতিহাস। অতীত মানুষের সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমষ্টি। সত্যের বিধান রচনার ক্ষেত্রে ইতিহাসের গুর"ত্ব মোটেও যথেষ্ট নয়। এছাড়া ইতিহাসের কোন অধ্যায় একাজে ব্যবহৃত হবে সে বিষয়েও সিদ্ধান্ড় গ্রহণের বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে দ্বন্দ্ব-মতপার্থক্য বিদ্যমান।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা হতে এটি বলা যায় যে, মানুষ তার যোগ্যতা ও সহায়ক শক্তি দ্বারা আদৌ সত্যের বিধান প্রণয়ন করতে সক্ষম নয়।

সত্যকে বাদ দিয়ে যে জাতি বা রাষ্ট্র তাদের জীবন বিধান রচনা করে, সে বিধান তাদের জন্য যেমন হয় যুলুম পূর্ণ, তেমনি তা কোন নির্দিষ্ট মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারেনা। ফলে সে আইন অনুদিন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা রদ করা প্রয়োজন পড়ে। এতে তাদের জীবনে কোন স্থায়ী আদর্শ তথা মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় না। ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির"পণের কোন স্থায়ী আদর্শ বা মাপকাঠি থাকেনা। জাতি হিসেবে জাতীয় স্বার্থ আর ব্যক্তি হিসেবে ব্যক্তির ইচ্ছাই হয়ে দাঁড়ায় ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড।

পশ্চিমা বিশ্ব এ নীতি অবলম্বনের প্রেক্ষিতেই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এশিয়া, আফ্রিকা মহাদেশের সকল প্রাকৃতিক সম্পদ অকাতরে লুণ্ঠন করে স্ব-স্ব দেশে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছে। ফলে এসব দেশের ১৫% লোক বিশ্বের ৮৫% সম্পদ ভোগ ব্যবহার করছে। ফলশ্র"তিতে লুণ্ঠিত দেশের মানুষগুলো সম্পদের অভাবে কর"ণ ও দারিদ্র জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছে। সত্যের বিধান এটিকে কখনোই সমর্থন করেনা, বরং উহার তাৎক্ষণাৎ উৎসাদন প্রত্যাশী।

এই ক'বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যায়ভাবে ইরাক আক্রমন করে সে দেশের নিরপরাধ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করলো এবং জাতিকে দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়ে আজও হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। এটি কখনো সত্যের বিধান নৈতিকতা সমর্থিত নয়। এটি সম্পূর্ণ নৈতিকতা বির"দ্ধ।

সত্যের বিধান ভাল-মন্দের বিধান দিয়ে মানব জাতিতে সুরক্ষা প্রদান করেছে। কিন্তু সত্যচ্যুত জাতি সত্যকে গর্ব ভরে প্রত্যাখ্যান করায় তাদের ব্যক্তিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবনে মহা ধ্বংসের শিকারে পরিণত হচ্ছে। অবাধ ও অপবিত্র যৌন মিলনে এইডস রোগ, শুকর পালন ও উহার মাংস ভক্ষনে সোয়াইন ফ্লু রোগ, আকুণ্ঠ মদ পানে মানসিক ও দৈহিক বিকলাঙ্গ, সুদের ব্যবসা ও অসৎ লেন-দেনের ফলে সৃষ্টি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি দুর্যোগ। বলতে কি সত্যের বিধান অর্থাৎ নৈতিকতা পরিত্যাগের ফলশ্র"তি মাত্র। নৈতিক বিধান প্রত্যাখ্যান করায় তাদের জীবনে অবৈধ অর্থ লিপ্সা ও অসংযত ও আকুণ্ঠ ভোজন-পান একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা কিনা একটি পশুর তুল্য বটে। এসব দেশের মানুষের জীবনে কোন সন্ড়োষ (Contenment) নেই। এখন প্রশ্নঃ এসব দেশে কি তাঁদের প্রণীত আইনের শাসন নেই? এ প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ, আছে এসব অনৈতিক তথা মানবতা বিধ্বংসী বিধানগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্যই। ইহা সত্যিকার আইনের শাসনের পরিপন্থী। কেননা আইনের শাসন বলতে সত্য ও ইনাসাফপূর্ণ আইনের মানবিক অনুশীলনকে বুঝায় যা কিনা একজন মানুষ থেকে সমগ্র বিশ্বমানতার জন্যমহা কল্যাণকর ও শান্ড়িময়।

সত্য কথা বলতে কি, সত্যের বিধান প্রত্যাখ্যান করায় এসব জাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ড়ে এসে পৌঁছেছে। এদের শরীর থেকে অতীতে যে সব জাতি সত্যের বিধান লংঘন করায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

উপসংহার ঃ প্রকৃত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নৈকিতকার প্রয়োজনীতা ও গুর"ত্ব অনস্বীকার্য। নৈতিকতার বিধান অনুসরণ ছাড়া আইনের শাসন, প্রহসন, প্রবঞ্চনা, যুলুম, শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেমিনারের এই প্রবন্ধের মাধ্যমে আশা করি আমরা প্রত্যেকেই বিষয়টি যথাযথ উপলব্ধিতে সক্ষম হবো। এবং এতেই আমাদের এ প্রচেষ্ঠার স্বার্থকতা ও সফলতা।

॥ সমাপ্ত ॥